এগ্রোবেসড ফুড-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)





নবম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

এগ্রোবেসড ফুড-১

Agrobased Food-1

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৬১১১

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. মো: আসলাম আলী
অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
মোহাম্মদ রহিদুল আলম
মো: জসিম উদ্দিন মুজাহিদ
প্রকৌশলী মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
মো: নুরুজ্জামান
মনিরা শিকদার (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

এগ্রোবেসড ফুড-১

প্রথম অধ্যায়

এগ্রোবেসড ফুড কাজে নিরাপত্তা অনুশীলন

Safety Practices in Agrobased Food Processing





বর্তমান যান্ত্রিক যুগে একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনযাপনের কামনা প্রতিটি মানুষের। আর স্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজন কাজ করা। যেকোনো কাজ শুরু করার আগেই প্রয়োজন কাজের পরিবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিল্পকারখানায় নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার পূর্বশর্ত হলো নিরাপত্তা বিধিগুলোর যথাযথ অনুশীলন ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। দুর্ঘটনা কখনও বলে কয়ে আসে না, অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয়। ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। পূর্ব থেকে নিরাপত্তা বিধিগুলো জেনে যথাযথভাবে পালন করলে অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে আমরা সহজেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করতে পারব।
- জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব।
- বিপদ ও ঝুঁকি বিষয়ে রিপোর্ট করতে পারব।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভাতে পারব।

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা নীতিমালা

কর্মক্ষেত্রকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেক কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে কর্মীরা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যথা-

- যথাযথ আসন, আলোক ও ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যথাযথ বহির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে।
- মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট এবং লকার সুবিধা থাকতে হবে।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বা ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নীতিমালা

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো কার্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে থাকতে হবে। যথা-

- কারখানার অভ্যন্তরে নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক চিহ্ন/চিত্র দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে।
- কারখানার বিভিন্ন বর্জ্য নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।
- কাজ শেষে মেশিন ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (Occupational Safety and Heath বা OSH) বিধিসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

১.১.১ ওএসএইচ (OSH) বিধিসমূহ

- কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের অনিরাপদ কাজ প্রত্যাখান করার অধিকার নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করার ব্যবস্থা করা।
- কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বা Personal Protective Equipment (PPE) সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে কোন ধরণের ঝুঁকি না থাকার বিষয় নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে OSH সম্পর্কে কর্মীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১.১.২ ওএসএইচ (OSH) নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা

- কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখা।
- কর্ম পরিবেশের কারণে কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ করা।
- কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম পরিবেশ তৈরি করা।
- সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে আনা।

১.১.৩ কার্যক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

প্রত্যেক কর্মীরই কাজের পূর্বে কর্মক্ষেত্রে তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সম্পর্কে ভালোমত ধারণা থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মীর দায়িত্ব সম্পর্কে যে সকল প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যক তা নিচে উল্লেখ করা হল-

- কাজ শুরুর আগে কার্যক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল নিয়ম কানুন জেনে নেওয়া।
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে নির্ধারিত নির্দেশনা যথাযথভাবে জানা ও মানা।
- কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানা না থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দক্ষ/অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জেনে নেওয়া।
- কাজের সময় যথাযথ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা এবং ব্যবহার শেষে যথাস্থানে রেখে দেওয়া।
- জরুরি চলাচলের রাস্তা, বহির্গমণ রাস্তা ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেওয়া।
- ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি লক্ষ্য করা মাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।

- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।
- কর্মক্ষেত্রে ধূমপান না করা।

১.১.৩ রেজিস্টার মাফিক কর্ম

কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রতিদিনের কর্ম তালিকার একটি লগ বুক রেজিস্টার মেনে কাজ করার পদ্ধতিকে রেজিস্টার মাফিক কর্ম বলে। এই রেজিস্টার বুকে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজের তালিকা দেওয়া থাকে। এছাড়াও সকল কাজের জন্য মান সম্পন্ন কর্ম পদ্ধতির তথ্য সম্বলিত কর্মতালিকা (Job Sheet) দেওয়া থাকে। কর্মীদের এই কর্মতালিকা দেখে তাদের নিজ নিজ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হয়। প্রতিটি কাজ সম্পাদনের জন্য তথ্য শীটে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, প্রয়োজনীয় PPE ও কাজের ধারা উল্লেখ থাকে।

১.২ বেসিক সেফটি এবং সিকিউরিটি

কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তি, যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত পণ্যসহ সব কিছুকে সম্ভাব্য বিপদ, ঝুঁকি বা হুমকি থেকে নিরাপদে রাখার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিমূলক সকল কর্মকান্ডকে উক্ত কর্মক্ষেত্রের সিকিউরিটি বলে। অন্যদিকে, সেফটি হল উক্ত কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরণের সম্ভাব্য বিপদ বা হুমকি থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা বা পূর্বপ্রস্তুতি।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোন কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের প্রত্যেককে সম্ভাব্য বিপদ বা ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার জন্য যে কর্মপরিকল্পনা থাকে সেটাই ঐ কর্মীদের জন্য সেফটি। আর সিকিউরিটি হল কর্মক্ষেত্রের বাইরে থেকে সম্ভাব্য যে কোন ধরণের আক্রমণ বা সংঘর্ষ থেকে পুরো কর্মক্ষেত্র ও কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। অতএব, সিকিউরিটি হল কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেক কর্মীর সেফটি নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত সকল ধরণের পূর্বপ্রস্তুতি।

১.২.১ বেসিক সেফটি ট্রেনিং

বেসিক সেফটি ট্রেনিং মূলত কর্মীদেরকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নিয়মিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেসিক সেফটি ট্রেনিং এর প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে-

দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য: দেশে শিল্প কারাখানাসমূহের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকসহ সকলকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা।

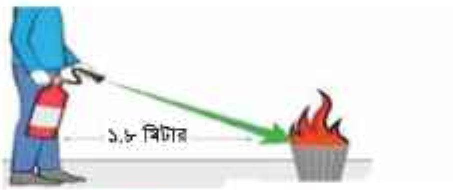
১.২.২ ফায়ার বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ট্রেনিং

আগুন নিভানোর জন্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার পদ্ধতির ধাপসমূহ দেওয়া হল -



চিত্র ১.১: অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

- ন্যূনতম ১.৮ মিটার দূর থেকে আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।



- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি শক্ত করে ধরতে হবে এবং লক পিন খুলতে হবে।



- আগুনের উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।



- একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ঘুরিয়ে স্প্রে করতে হবে।



কর্মক্ষেত্রে আগুন লাগলে যা করতে হবে-

- আগুন দেখার সাথে সাথে ফায়ার ফাইটিং এর যে সরঞ্জাম আছে তা দিয়েই দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে হবে।

২০২৫

- কর্মক্ষেত্রের সকলকে যত দ্রুত সম্ভব আগুন লাগার কথা জানিয়ে দিতে হবে অথবা আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার এলার্ম বাজাতে হবে।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে এবং স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

১.২.৩ হ্যাজার্ড ও হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন

হ্যাজার্ড (Hazard): হ্যাজার্ড বা আপদ হলো এমন কোনো উৎস বা বস্তু যার মাধ্যমে অসুস্থ হওয়া ও সম্পদ বা পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এককথায় হ্যাজার্ড হলো উৎপাদিত বা প্রস্তুতকৃত পণ্যে ক্ষতিকর দ্রব্যাদির সম্ভাব্য উৎস।

হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন: হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে এক ধরণের কর্মসূচী যা প্রধানত কর্মক্ষেত্রে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কিত ক্ষতি ও অসুস্থতা থেকে কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা। এই পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রের সকল কর্মীকে সম্ভাব্য বিপদের উৎস বা বস্তু ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ও বোঝার অধিকার নিশ্চিত করে।

১.২.৪ ঝুঁকি (Risk)

ঝুঁকি হলো সেই পরিস্থিতি, যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক ক্ষতি করতে সক্ষম। ঝুঁকি ধারণাটি প্রায়শই বিপদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১.২.৫ ঝুঁকির ধরণ

কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকির ধরণগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) **পরিবেশগত ঝুঁকি:** কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণে কর্মীদের যে ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় তাকেই পরিবেশগত ঝুঁকি বলে। পরিবেশগত ঝুঁকি আবার তিন ধরণের হতে পারে, যেমন- ভৌত ঝুঁকি, রাসায়নিক ঝুঁকি ও জৈবিক ঝুঁকি।

খ) **শারীরিক ঝুঁকি:** সাধারণত কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা শারীরিকভাবে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেসব ঝুঁকিকে শারীরিক ঝুঁকি বলে। যেমন- অত্যধিক তাপ বিকিরণ, উচ্চ শব্দ, উচ্চ তাপমাত্রা,ভাইব্রেশন, অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন, অপর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি।

গ) **রাসায়নিক ঝুঁকি:** যে সকল রাসায়নিক উপাদান একজন মানুষের শরীরে ক্ষতি বা বিপদ ঘটাতে পারে তাদেরকে রাসায়নিক ঝুঁকি বলে। যেমন- হালকা কুয়াশা, বিষাক্ত গ্যাস, বাষ্প, ধুলা, উগ্র বা ঝাঁঝালো গন্ধের ধোঁয়া ইত্যাদি শরীরে প্রবেশ করলে বা ত্বকে লাগলে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

ঘ) **জৈবিক ঝুঁকি:** জীবন্ত বস্তু থেকে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় সেটি হলো জৈবিক ঝুঁকি।-যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, ছত্রাক, পোকামাকড়, উদ্ভিদ, প্রাণী বা পাখির সাথে সম্পকযুক্ত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি। এসবের সংস্পর্শে বা আক্রমণের ফলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

ঙ) **কর্মদক্ষতার ঝুঁকি :** কর্মক্ষেত্রে সাধারণত কর্মদক্ষতার যে সকল ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয় তা হলো- কর্মক্ষেত্র বা যন্ত্রপাতির অনুপযুক্ত ডিজাইন, অসঙ্গত লিফটিং, দুর্বল দৃশ্যমান অবস্থা, অসামঞ্জস্যপুর্ণ বা অকওয়ার্ড অবস্থা, দুর্বল ফার্নিচার ডিজাইন, অতিরিক্ত কম্পন এবং গতির পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি।

চ) **নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি:** এগুলো এমন ধরনের ঝুঁকি যা কর্মস্থল থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা উচিত। ব্যক্তির নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করবে এমন অনিরাপদ দড়ি ,ক্যাবল বা তার. ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি, অনিরাপদ উচ্চতা ইত্যাদির কারণে যেসব ঝুঁকির সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি বলে।

১.২.৬ হ্যাজার্ড চেকলিস্ট

কার্যক্ষেত্রে যেকোন স্থানে যেকোন সময় পরিবেশগত কিংবা যন্ত্রপাতির ত্রুটিজনিত কারণে বড় ধরনের যেকোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্ভাব্য এসব দুর্ঘটনা ও তাদের কারণসমূহকে ধারাবাহিকভাবে তালিকাবদ্ধ করা হলে সেই তালিকাকে আপদ তালিকা (Hazard checklist) বলে। সাধারণত আপদ তালিকা প্রণয়নে যেসব বিষয়ে সমীক্ষার প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো-

- হাউজকিপিং
- মেশিন হ্যাজার্ড
- আগুন বা ফায়ার হ্যাজার্ড
- প্রটেকটিভ ডিভাইস
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
- টুলসমূহ

উৎপাদনশীল শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি আপদ তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

প্লান্ট বা বিভাগের নাম : ………………… তারিখ : ……………

এ বিবরণীতে সন্নিবেশিত কার্যকলাপ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যবলির মধ্যে যেগুলো সন্তোষজনক সেগুলোর জন্য নির্ধারিত স্থানে টিক (√) চিহ্ন এবং যেগুলো অসন্তোষজনক সেগুলোর জন্য নির্ধারিত স্থানে ক্রস (×) চিহ্ন দিয়ে বিপজ্জনক কর্মবিবরণী মুল্যায়ন করতে হবে।

বিবরণী	ফলাফলের চিহ্ন	বিবরণী	ফলাফলের চিহ্ন	বিবরণী	ফলাফলের চিহ্ন
১. অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা		**২. হাউস কিপিং**		**৩. মালামাল স্থানান্তরের যন্ত্রপাতি**	

ক. নির্বাপণী যন্ত্রসমূহ		ক. যন্ত্রপাতির আশপাশ, মেঝে, রাস্তা, উঁচু স্থান		ক. এলিভেটর	
খ. হোজ পাইপ, স্প্রিংকলার হেড		খ. মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ		খ. ক্রেন	
গ. প্রবেশ পথ, সিঁড়ি		গ. আলো-বাতাস		গ. কনভেয়রস্	
ঘ. দাহ্য বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ		ঘ. বর্জ্য অপসারণ		ঘ. ক্যাবল, রোপ, চেইন	
৪. টুলস		**৫. বিজ্ঞপ্তি ফলক**		**৬. প্রেসার ইকুইপমেন্ট**	
ক. পাওয়ার টুলস		ক. পরিষ্কার ও আকর্ষণীয়		ক. স্টিম ইকুইপমেন্ট	
খ. হ্যান্ড টুলস		খ. নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন		খ. এয়ার রিসিভার অ্যান্ড কম্প্রেসর	
গ. টুলস সংরক্ষণ		গ. পর্যাপ্ত আলোক ব্যবস্থা		গ. গ্যাস সিলিন্ডার ও হোজ পাইপ	
৭. যন্ত্রপাতি সমূহ		**৮. অনিরাপদ কার্যকলাপ**		**৯. প্রাথমিক চিকিৎসা**	
ক. ঘূর্ণায়মান ও চলমান যন্ত্রাংশের গার্ড		ক. যন্ত্রপাতির অনিরাপদ গতি		ক. ফাস্ট এইড বক্স এবং কক্ষ	
খ. বেল্ট, পুলি, গিয়ার, শ্যাফট্		খ. বিপজ্জনক স্থানে ধূমপান		খ. রোগী বহন খাট/ট্রলি	
গ. অয়েলিং, ক্লিনিং		গ. হাসি ঠাট্টা ও রঙ্গ ব্যঙ্গ		গ. প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র	
ঘ. মেইনটেন্যান্স		ঘ. মেশিন গার্ড অকার্যকরকরণ			
১০. ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম					
ক. গগল্‌স,		গ. গ্লাভস		ঙ. নিরাপত্তামূলক	

হ্যান্ডশিল্ড, হেলমেট				পোশাক	
খ. নিরাপত্তামূলক জুতা		ঘ. গ্যাস মাস্ক/বায়ু ফিল্টার মাস্ক			

১.২.৭ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH): পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হলো কাজ বা চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণবিষয়ক নিয়ম-শৃঙ্খলা বা নিয়মনীতি। পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্তকরণ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদান করা। অর্থাৎ যারা কর্মপরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া OSH এর প্রধান উদ্দেশ্য।

১.২.৮ জরুরি প্রস্থান পদ্ধতি

- সকল কার্যক্রম দ্রুত বন্ধ করতে হবে।
- নিকটস্থ জরুরি প্রস্থান চিহ্ন দেখে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে।
- হ্যাজার্ড ও ঝুঁকি থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে।
- দূর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিপূর্ণ বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় প্রবেশ করা যাবে না।

১.২.৯ ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট

ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে একজন কর্মীর স্বাস্থ্যগত বিষয়, যা কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- অতিরিক্ত শব্দ, ক্ষতিকর রাসায়নিক ধোঁয়া ইত্যাদি। এই সকল ক্ষতিকর পরিবেশ একজন কর্মীর স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই এই সকল ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকেই বলা হয় ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট। ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট এর ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হল-

প্রথম ধাপ	:	ক্ষতিকর ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা। যেমন- শারীরিক, মানসিক, রাসায়নিক, জৈবিক ইত্যাদি।
দ্বিতীয় ধাপ	:	কর্মীদের মধ্যে কারা এবং কিভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তা চিহ্নিত করা।
তৃতীয় ধাপ	:	ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
চতুর্থ ধাপ	:	পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ফলাফল সংরক্ষণ করা।
পঞ্চম ধাপ	:	ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা।

১.২.১০ অকুপেশনাল সেফটি এর প্রয়োজনীয়তা

- নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখা।
- কাজের যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখা।

২০২৫

- কাজের পরিবেশের কারণে কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ করা।
- বিপজ্জনক কাজ বা ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে কর্মীদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।
- কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী পেশাগত পরিবেশ তৈরির ব্যবস্থা করা।

১.৩ সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীক

কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীকের নির্দেশনা অত্যন্ত আবশ্যক। সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীক মূলত একটি চিত্র যা নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনাকে নির্দেশ করে। লিখিত শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে সুরক্ষা চিহ্ন বা প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে ব্যবহার করা হয়। একটি ছবি শব্দের চাইতে বেশি তথ্য প্রদান করে থাকে। তাছাড়া ছবি সব শ্রেণি পেশা ও ভাষাভাষী মানুষের নিকট বোধগম্য হয়।

১.৩.১ নির্দেশনামূলক চিহ্ন

নির্দেশনামূলক চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা

- কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়াদি দ্রুত বুঝতে সাহায্য করবে।
- সকল ব্যক্তি সুরক্ষা চিহ্ন বুঝতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে কর্মীরা দ্রুত ধারণা লাভ করবে।
- দ্রুত বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করতে পারবে।
- প্রাথমিকভাবে আগুন নিভানোর কাজে অংশগ্রহণ সহজ করবে।
- কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হাইজিন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে দ্রুত ধারণা লাভ করবে।
- ধূমপানমুক্ত এলাকা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সহজ হবে।

১.৩.২ দিক নির্দেশনামূলক চিহ্নসমূহ

নির্দেশনামূলক চিহ্ন	বিবরণ	নির্দেশনামূলক চিহ্ন	বিবরণ
	কর্মীদের নির্দিষ্ট দিক দিয়ে প্রস্থান করার জন্য ব্যবহার করা হয়।		কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হলে এই দিক দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়।
	কোন কর্মী কর্মক্ষেত্রে আহত হলে 'এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যাবে' এটা নির্দেশ করে।		তাৎক্ষণিক বিপদ ঘটতে পারে এমন ধরণের ঝুঁকিপূর্ন পরিস্থিতি বুঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

	উচ্চ ভোল্টেজ এলাকা বুঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।		এই চিহ্ন সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ/বিষাক্ত এলাকা বা বস্তু নির্দেশ করে।
	আসন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতি নির্দেশ করতে এটা ব্যবহার করা হয়।		এটি সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশ করে।
	এটা 'বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ' নির্দেশ করে।		'এটা ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকা' নির্দেশ করে।
	ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি দূর করতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।		'এটা ক্ষয়কারক রাসায়নিক উপাদান' নির্দেশ করে।
	এটা 'অতিমাত্রায় শব্দযুক্ত এলাকা' নির্দেশ করে।		এটা সংক্রামক জৈব উপাদান যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি নির্দেশ করে।

১.৪ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

Personal Protective Equipment (PPE) বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম হলো এক ধরণের পোশাক বা সরঞ্জাম যার ব্যবহার মানুষকে আহত হওয়া অথবা অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। যেমন- ইয়ার মাফস, ইয়ার প্লাগস, অ্যাপ্রন, মাস্ক ইত্যাদি।

১.৪.১ পিপিই নির্বাচন

পিপিই এর নকশা বা ডিজাইন এবং গঠন নিরাপদ হতে হবে। পিপিই এর ব্যবহার সহজ হতে হবে। মানানসই ও আরামদায়ক হওয়ার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সকল পিপিই একই সঙ্গে পরার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম এ যা থাকে-

- মাথা সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- হেলমেট, হেয়ার নেট, সান হ্যাট।
- হাত সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- গ্লোভস।
- চোখ ও মুখ সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- গগলস, মাস্ক।
- শ্বাসতন্ত্র সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- রেসপিরেটরস।
- কানের সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- ইয়ার মাফস, ইয়ার প্লাগস।
- পায়ের সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- নিরাপদ জুতা।
- শরীর সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- অ্যাপ্রন, ইউনিফর্ম, ভেস্ট, লাইফ জ্যাকেট।
- উচ্চতা সুরক্ষা সরঞ্জাম। যেমন- Body harnesses, Fall-arrest systems, Lowering harnesses, Rescue lifting, Body belt, Energy absorbers.

২০২৫

১.৪.২ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার

পিপিই এর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল-		
ধাপ-১	**ধাপ-২**	**ধাপ-৩**
১. পিপিই পরিধান করার জন্য পরিকল্পনা করা।	১. নিরাপদ জুতা পরিধান করা অথবা শু কভার (Shoe cover) পরিধান করা।	১. অ্যাপ্রন পরিধান করা।
২. কাজের সাথে সম্পৃক্ত পিপিই শনাক্ত করা এবং সংগ্রহ করা।		
ধাপ-৪	**ধাপ-৫**	**ধাপ-৬**
১. মুখ ঢাল পরিধান করা।	১. মাথায় হেলমেট/হেয়ারনেট পরিধান করা।	১. হাত ধোয়া সম্পাদন করা।
২. মাস্ক পরিধান করা।		২. গ্লোভস পরিধান করা।
৩. গগলস পরিধান করা।		
পিপিই খুলে ফেলার পদ্ধতি :		
ধাপ-১	**ধাপ-২**	**ধাপ-৩**
১. প্রথমে গ্লোভস খুলে ফেলা এবং নির্দিষ্ট স্থানে রাখা।	১. হেয়ার নেট/হেলমেট/ক্যাপ খুলে ফেলা।	১. মাস্ক অপসারণ করা।
২. হাত ধোয়া সম্পাদন করা।	২. নিরাপদভাবে মুখ ঢাল অপসারণ করা।	২. গগলস অপসারণ করা।
ধাপ-৪		৩. পুনরায় প্রসেসিং এর জন্য পৃথক কন্টেইনারে গগলস রাখা।
১. অ্যাপ্রন খুলে ফেলা।		
২. পুনরায় হাত ধোয়া সম্পাদন করা।		

১.৪.৩ পিপিই ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

নিচে পিপিই ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হল-

- পিপিই রাসায়নিক ক্ষতি হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারেনা।
- একবার ব্যবহারযোগ্য পিপিই কোনক্রমেই পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।
- পিপিই পুরোপুরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনা।
- মৌলিক নিরাপত্তা যেমন- সচেতনতা, গৃহ পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক।
- পিপিই অনেক সময় কর্মীর স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন- শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, মাথাব্যাথা, ত্বকের জ্বালা-পোড়া ইত্যাদি।

১.৫ দুর্ঘটনা

কর্মক্ষেত্রে কোন অনিরাপদ কাজ বা অবস্থার কারণে যদি এমন কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যার ফলে কোন কর্মী আহত বা নিহত হয় অথবা হওয়ার আশংকা থাকে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তাহলে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অবস্থাকে দুর্ঘটনা বলে। আমেরিকান "The National Safety Council" এর মতে "কলকারখানায় সংঘটিত কোন ঘটনা বা দ্রুত সংঘটিত ঘটনাসমূহ যা অনিরাপদ কাজ ও অনিরাপদ অবস্থা হতে সৃষ্টি হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কোন কর্মীকে আহত বা নিহত করে তাকে শিল্প দুর্ঘটনা বলে"।

১.৫.১ দুর্ঘটনার প্রকারভেদ

দুর্ঘটনা সংঘটনের মাধ্যম এবং এর ক্ষয়ক্ষতির উপর ভিত্তি করে সকল ধরনের দুর্ঘটনাকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

শারীরিক দুর্ঘটনা: শারীরিক দুর্ঘটনা বলতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন অবস্থা বা ঘটনার কারণে কোন কর্মীর শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বোঝায়। যেমন-যানবাহনজনিত দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, আগুনজনিত দুর্ঘটনা, রাসায়নিক সংস্পর্শজনিত দুর্ঘটনা, অনুপযুক্ত বিল্ডিং ডিজাইনজনিত দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা।

অভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনা: অভ্যন্তরীন দুর্ঘটনা বলতে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া, ভুল তথ্য দেওয়া, কোন ফাইল হারিয়ে ফেলা বা ডাটাবেস থেকে মুছে ফেলা, নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে ভূলে যাওয়া ইত্যাদিকে বোঝায়।

১.৫.১ দুর্ঘটনা সংঘটনের কারণ ও প্রতিকার

দুর্ঘটনা কখনই বলে কয়ে আসেনা। কিন্তু এর পরিণতি হয় নেতিবাচক। তবে আগে থেকে সতর্ক থাকলে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। দুর্ঘটনার প্রধান ২ টি কারণ হচ্ছে-

অনিরাপদ কাজ: অনিরাপদ কাজের কারণ হচ্ছে-

- অসংগত মনোভাব
- জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব
- শারীরিকভাবে খাপ না খাওয়া
- অনুপযুক্ত যান্ত্রিক বা শারীরিক পরিবেশ

অনিরাপদ পরিস্থিতি: অনিরাপদ পরিস্থিতি বলতে কর্মক্ষেত্রে কোন বস্তু বা মেশিন দ্বারা কিংবা পরিবেশে বিদ্যমান ভৌত বা রাসায়নিক অসামঞ্জস্যতার কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনাকে বোঝায়।

১.৬ জরুরি করণীয়সমূহ

কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীকে জরুরি করণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। জরুরি করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে কর্মক্ষেত্রে

২০২৫

কর্মীরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন- দ্রুত প্রস্থানের অবস্থান, জরুরি মূহুর্তে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করার প্রক্রিয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তির স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। জরুরি করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে-

- জরুরি প্রস্থানের অবস্থান চিহ্নিতকরণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাপ্তির স্থান চিহ্নিতকরণ
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান চিহ্নিতকরণ
- উদ্ধার পদ্ধতি এবং মাস্টার স্টেশন চিহ্নিতকরণ
- কর্মক্ষেত্রে হ্যাজার্ড বা বিপদের উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি: ডাক্তার আসার পূর্বে অথবা ডাক্তারের কাছে স্থানান্তর করার পূর্বে আকস্মিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে জরুরি ভিত্তিতে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- রোগীর জীবন রক্ষা করা
- রোগীর অবস্থার অবনতি প্রতিরোধ করা
- রোগীর অবস্থার উন্নতিসাধন করা

জরুরি ধৌতকরণ স্থান: অনেক সময় কর্মীরা অ্যাসিড বা বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হলে দ্রুত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব। তাই কর্মীদের জরুরি চক্ষু ধৌতকরণ স্থান, ঝরনা ও বেসিন এর স্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে হবে।

অগ্নি নিরাপত্তা পদ্ধতি ও রেগুলেশন: কর্মক্ষেত্রে আগুন সৃষ্টির প্রধান ৩ টি উপকরণ হচ্ছে-

- জ্বালানী পদার্থ যেমন- পেট্রোল, শুকনো কাগজ বা কাপড়, অন্য কোন দাহ্য পদার্থ
- তাপ
- অক্সিজেনের উপস্থিতি

প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতি: আগুন বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই হাতের কাছে থাকা যে কোন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নেভানোর প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপন বলে। প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বা ব্যবস্থার তালিকা নিচে দেওয়া হল-



চিত্র ১.২: আগুন সৃষ্টির উপকরণ

ক. ওয়াটার টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র-

- সোডা এসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- স্টোরড প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- গ্যাস প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

২০২৫

খ. ফোম টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র-

- রাসায়নিক ফোম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- মেকানিক্যাল ফোম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

গ. CO_2 টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

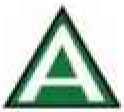
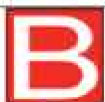
ঘ. শুষ্ক রাসায়নিক টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র-

- গ্যাস কার্টিজ অপারেটেড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
- স্টোরড প্রেসার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

ঙ. হ্যালন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

চ. স্প্রিং কলার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র-

আগুনের শ্রেণীবিভাগ : আগুন নেভানো যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে আগুন কে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

আগুনের ধরন ও প্রতীক	চিত্র	বর্ণনা	নির্বাপন যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা
		সাধারণ আগুন (কাগজ, কাপড়, কাঠ, রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি জনিত)।	তাপ শোষনকারী তরল বা রাসায়নিক।
		দাহ্য তরল বা দাহ্য বাষ্পজনিত আগুন।	ফোম টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
		বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দ্বারা সৃষ্ট আগুন।	অপরিবাহী এজেন্ট অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
		দাহ্য ধাতুজনিত আগুন (ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম)।	তাপ শোষনকারী উপাদান। যা জলন্ত উপাদানের সাথে ক্রিয়াশীল নয়।
		উচ্চ তাপমাত্রার তেল বা রান্না সংশ্লিষ্ট আগুন।	ভেজা পটাশিয়াম এসিটেট, কম pH ভিত্তিক উপাদান ব্যবহার করা হয়।

অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- সকল দাহ্য বস্তু এবং দাহ্য বস্তু রাখার এলাকা চিহ্নিত করে ট্যাগ লাগাতে হবে।
- সকল দাহ্য বস্তুর কন্টেইনার ঢাকনাযুক্ত হতে হবে।
- কোথাও দাহ্য বস্তু ছড়িয়ে গেলে দ্রুত তা বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

২০১৫

- দাহ্য বস্তুর এলাকায় খোলা আগুন/জ্বলন্ত সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে সকল কর্মীদের অগ্নি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ফায়ার সার্ভিস টিম গঠন করতে হবে।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত যন্ত্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৭ গৃহ পরিচ্ছন্নতা

গৃহের পরিবেশকে সুন্দর আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য ভিতরে ও বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মশা-মাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশ কম থাকে। ফলে রোগজীবাণু সহজে ছড়াতে পারে না। সেজন্যে গৃহের সব জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। গৃহের অভ্যন্তরীণ স্থানে যেসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক তা হলো।

- মেঝে ঝাড়ু দেওয়া, মোছা বা লেপা।
- দরজা জানালার গ্রিল এবং কাঁচ পরিষ্কার করা।
- দেয়াল, সিলিং, বৈদ্যুতিক পাখা পরিষ্কার করা।
- সিঙ্ক ও বেসিন পরিষ্কার করা।
- যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা।
- বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা।
- বাথরুম বা টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার করা।

১.৭.১ গৃহ পরিচ্ছন্নতার সংজ্ঞা

শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে "গৃহ পরিচ্ছন্নতা" বলতে কারখানা গৃহের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশকে বুঝায়। পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কর্মক্ষেত্রে কর্মীর শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং কর্মীর কাজের মনোভাবকে প্রফুল্ল করে। গৃহ পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতিকে 5S দ্বারা অভিহিত করা হয়। 5S হলো কার্যক্ষেত্র পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার একটি উচ্চ মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া।

5S এর উদ্দেশ্য

- ভালোভাবে কাজ করার জন্য কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত করা, আইন, মানদন্ড এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- 5S অনুশীলন করলে কর্মীদের ভেতর ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- কাজকে সহজ, দ্রুত, নিরাপদ, লাভজনক ও আরো অধিক কার্যকরী করতে 5S গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

5S হচ্ছে-

S = Sort (বাছাই করা)

২০২৫

S = Set in order (সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো)

S = Shine (দৃষ্টিগোচর হওয়া)

S = Standardize (মান সম্পন্ন করা)

S = Sustain (অব্যাহত রাখা)

১.৭.২ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ

নিম্নে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

- কারখানার লে-আউট সঠিক ও বাস্তবসম্মত না হওয়া।
- শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাঝে সচেতনতা না থাকা।
- নিরাপদ বিধি বা কারখানা আইন যথাযথভাবে পালন না করা।
- কারখানায় মাত্রাতিরিক্ত তাপ উৎপাদন।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখা।
- কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য ও অন্যান্য টুলসমূহ যত্রতত্র ফেলে রাখা।
- ধুলা ও ধোঁয়া বের হওয়ার ব্যবস্থা না থাকা।
- বর্জ্য ও তরল পদার্থসমূহ অপসারণের সুব্যবস্থা না থাকা।
- উপযুক্ত টয়লেট বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।
- নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণের অভাব।

১.৭.৩ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিকারী মাধ্যমসমূহ

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিকারী মাধ্যমগুলো হচ্ছে -

- **রাসায়নিক মাধ্যম:** যেমন- বাষ্প, ফিউম (ধুম), গ্যাস (কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস) ইত্যাদি।
- **জৈব মাধ্যম:** যেমন- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর উৎপত্তি।
- **ভৌত মাধ্যম:** যেমন- সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি, অতি উচ্চ মাত্রার শব্দ, এক্স-রে ইত্যাদি।

১.৭.৪ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

শিল্প কারখানায় কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

- প্রত্যেক কারখানাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- টয়লেট বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দুর্গন্ধমুক্ত রাখতে হবে।
- বায়বীয় পদার্থ নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অবাধ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০২৫

- পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের জন্য আলাদা আলাদা ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং পোশাক পরিবর্তন রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৭.৫ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উপকারিতা

শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকারিতা নিচে দেওয়া হলো-

- কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- দুর্ঘটনা কম হয়।
- দ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিত হয়।
- যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- উৎপাদন ব্যয় কম হয়।

১.৭.৬ বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারকরণ যন্ত্রপাতি

নিচে বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক যন্ত্রপাতির তালিকা দেওয়া হল-

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, পলিশার, ড্রায়ার, স্কুইজার/হুইপার, বালতি, মপ, ব্রুম, সিলিং ব্রুম, ডাস্ট প্যান, ব্রাশ, প্যাড, ডাস্টার, ডাস্টবিন, প্লাস্টিক লাইনার, ক্লিনিং/সেইফটি সাইন, ওয়েট এবং ড্রাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি।

১.৭.৭ বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কারক ও সেনিটাইজিং দ্রব্য

নিচে বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিং এবং সেনিটাইজিং এজেন্ট এর তালিকা দেওয়া হলো-

- পানি
- সাবান
- ডিটারজেন্ট
- ক্লোরিন ট্যাবলেট
- আয়োডিন
- ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি।

১.৭.৮ প্লান্ট মেঝে পরিষ্কারকরণ কৌশল

প্লান্ট মেঝে বিভিন্নভাবে পরিষ্কার করা যায়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- সুইপিং বা ঝাড়ু দেয়া
- মপিং
- ভ্যাকুয়ামিং
- স্ক্রাভিং ও পলিশিং
- স্কুইজিং
- ওয়াটার স্প্রে

- স্ক্র্যাপিং
- এয়ার ব্লোয়িং

স্যানিটাইজিং-এর পদ্ধতি

প্লান্ট মেঝে স্যানিটাইজ করার কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো-

- কেমিক্যাল বা স্যানিটাইজার প্রয়োগের মাধ্যমে।
- গরম পানি ব্যবহার করে।
- স্টিম বা গরম বাষ্প ব্যবহার করে।
- উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে।

কার্যকর স্যানিটাইজিং প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে।

- স্যানিটাইজিং কেমিক্যালের সঠিক মাত্রা ও ঘনত্ব।
- কেমিক্যাল প্রয়োগের পর জীবাণু ধ্বংস হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময়।
- কেমিক্যাল সলিউশন বা দ্রবণের কার্যকারিতার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা।

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: OSH (Occupational Safety and Health) নীতিমালা এবং নিরাপদ পদ্ধতিগুলো চিহ্নিতকরণ

পারদর্শিতা/মুল্যায়ন মানদন্ড

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

১.৩ OSH নীতিমালা অনুসরণ করবে।

১.৪ সুরক্ষা চিহ্ন ও প্রতীকগুলো চিহ্নিত এবং অনুসরণ করবে।

১.৫ আকস্মিক দুর্ঘটনায় করনীয় বিষয়গুলো সরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে।

১.৬ প্রাথমিক নিরাপত্তার উপকরণসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৭ ফায়ার বা আগুন নির্বাপক দ্রব্যসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৯ চেকলিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

১.১০ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক
- গ্যাস নিরোধক মাস্ক
- কানের প্লাগ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- OSH পলিসি এবং পদ্ধতি সমূহ
  ক. OSH এর জন্য বাংলাদেশের মান
  খ. অগ্নি নিরাপত্তা বিধি
  গ. অনুশীলন কোড
  ঘ. শিল্প নির্দেশিকা
  ঙ. শ্রম আইন-২০১৮
- সুরক্ষা লক্ষণ এবং প্রতীক
  ক. দিক নির্দেশাবলী (প্রস্থান, জরুরি প্রস্থান ইত্যাদি)
  খ. প্রাথমিক চিকিৎসার ট্যাগ
  গ. বিপদ ট্যাগ ও লক্ষণ
  ঘ. সুরক্ষা ট্যাগ
  ঙ. সতর্ক সংকেত।

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তারপর সকল নির্দেশিকা ভালো করে পড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানবে।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সকল নির্দেশিকা ভালোমত পড়বে।

২০২৫

জব নং-০২

জবের নাম: ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরিধান অনুশীলন।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

২.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

২.৩ পিপিই শনাক্ত করবে।

২.৪ কাজের উপযোগী পিপিই পরিধান করবে।

২.৫ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

২.৬ চেকলিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক
- গ্যাস নিরোধক মাস্ক
- কানের প্লাগ

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তাত্ত্বিক **১.৪.১ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার অংশ** অনুসরণ করে কাজ করবে।

এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সকল নির্দেশিকা ভালোমত পড়বে।

জব নং-০৩

জবের নাম: প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলন।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

৩.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৩.২ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলনের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৩.৩ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগের উপকরণ সংগ্রহ করবে।

৩.৪ হ্যাজার্ড এর উৎস চিহ্নিত করবে।

৩.৫ বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করবে।

৩.৬ শক, কাটা, পোড়া ইত্যাদির উপর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করবে।

৩.৭ দুর্ঘটনার সময় তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করবে।

৩.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

৩.৯ চেক লিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স।

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- রোগীর দূর্ঘটনার কারণ বা রোগ নির্নয় করে যত দ্রুত সম্ভব তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার দেওয়ার পর পরিস্থিতি অনুযায়ী রোগীর অবস্থার উন্নতি কল্পে রোগীকে ডাক্তারের কাছে, হাসপাতালে বা তার বাড়ীতে নিরাপদে স্থানান্তর করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে সচরাচর যে সকল দুর্ঘটনা/অসুস্থতা ঘটে সে সকল দুর্ঘটনা/অসুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার বিবরণ নিচে ছক আকারে লিপিবদ্ধ করা হল-

দুর্ঘটনা/অসুস্থতার বিবরণ	প্রাথমিক চিকিৎসা
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া।	১. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে। ক. মুখ থেকে মুখে অথবা মুখ থেকে নাকে। খ. কার্ডিয়ো পালমোনারী রিসাসিটেশন (CPR)। **মুখ থেকে মুখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি** ক. রোগীর চিবুক তুলে ধরে গলা সোজা করতে হবে এবং মুখ খুলতে হবে। খ. এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক চেপে নাক বন্ধ করতে হবে। গ. বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিতে হবে। ঘ. রোগীর মুখের উপর মুখ চেপে ধরে আস্তে আস্তে তার মুখের ভেতরে শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে। ঙ. ৩০ সেকেন্ড বিরতি দিয়ে এভাবে মুখের ভিতরে শ্বাস দিতে হবে।
শরীরের কোন অংশ কেটে যাওয়া।	ক. দ্রুত ক্ষতস্থান অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল তরল দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করতে হবে। খ. কেটে যাওয়া অংশ কাপড় বা ব্যান্ডেজ দিয়ে চেপে ধরতে হবে। গ. কেটে যাওয়া অংশ যতসম্ভব উপরে উঠাতে হবে।
স্নায়বিক আঘাত বা শক বা অজ্ঞান হওয়া।	ক. রোগীর কাপড়ের বাঁধন ঢিলে ঢালা করতে হবে বা অতিরিক্ত কাপড় অপসারণ করতে হবে। খ. রোগীকে আরামদায়ক ভাবে শুইয়ে দিতে হবে। গ. রোগীর শরীর গরম রাখার জন্য গরম পানির বোতল ব্যবহার না করা বা হাত-পা ঘষা যাবে না। ঘ. কোন অবস্থাতেই অজ্ঞান রোগীর মুখে কোন তরল অর্থাৎ পানীয় জাতীয় কিছু দেয়া যাবে না। ঙ. রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে পানি, দুধ, চা ইত্যাদি খেতে দেওয়া যেতে পারে। চ. রোগীকে ঠান্ডা লাগলে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছ. অত্যাধিক গরমে জ্ঞান হারালে, রোগীকে বাতাস করতে হবে, মাথায় পানি ঢালা যেতে পারে, শরীর ঠান্ডা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। জ. রোগী যদি সে শ্বাস নিতে না পারে, তবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
বৈদ্যুতিক আঘাত	ক. মাটিতে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে। খ. শরীর গরম রাখার জন্য কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গ. রোগী পিপাসার্ত হলে ঠোঁট ভিজিয়ে দিতে হবে।

২০২৫

	ঘ. শ্বাস-প্রশ্বাস না চললে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
বিষক্রিয়া	ক. বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হতে পারে। খ. রোগী যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে- * বমি করানো যাবে না। * শক্ত বিছানায় চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে যাতে পেটে চাপ না পড়ে। * মাথা এমনভাবে কাৎ করে দিতে হবে যেন শ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। * রোগী যদি নিজে থেকেই বমি করে তবে তাকে আরামদায়ক পজিশনে শুইয়ে দিতে হবে, যাতে করে তার বমি কণ্ঠ নালীতে আটকে না যায়। * শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে। গ. রোগী সজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে- * রোগীকে বমি করাতে হবে। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পানি খাইয়ে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাতে হবে। * বিষ যদি দাহ্য পদার্থ হয় তবে বমি করানো যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।
অতিরিক্ত তাপে শরীরের ক্ষয়	ক. আহত রোগীকে ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। খ. আহত রোগীকে ওর স্যালাইন অথবা এক গ্লাস পানিতে চা চামচের অর্ধেক লবণ ও এক চামচ চিনি মিশ্রিত করে পানি পান করাতে হবে।
পুড়ে যাওয়া। ১ম মাত্রা- চামড়া ঝলসে যাওয়া। ২য় মাত্রা-পুড়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া। ৩য় মাত্রা- পুড়ে গিয়ে চামড়া ও মাংস গলে যায় বা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া।	ক. পুড়ে যাওয়া অংশে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং জ্বালা পোড়া ভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ঠান্ডা পানি বা বরফে ডুবিয়ে রাখতে হবে। খ. ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে পোড়া স্থানে বার্ণ অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হবে। গ. তারপর জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ দিয়ে হালকা করে বেঁধে দিতে হবে। ঘ. ৩য় মাত্রা পোড়া হলে কোন ওষুধ লাগানো যাবে না। ঙ. ফোসকা পড়লে তা গলানো যাবে না। চ. ৩য় মাত্রার পোড়া হলে লেগে থাকা কাপড় টেনে উঠানো যাবেনা। অতিরিক্ত কাপড় কেটে নেওয়া যেতে পারে। ছ. ৩য় মাত্রার পোড়া রোগীকে প্রচুর স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
হাড় ভেঙে গেলে	ক. ক্ষতস্থানে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। খ. অবস্থার অবনতি রোধে আঘাত প্রাপ্ত অংশ উপরে উঁচু করে রাখতে হবে। গ. আঘাত প্রাপ্ত অংশ টুকরা কাঠের সাহায্যে সংযোগ করতে হবে।
নাকে রক্ত আসলে	ক. বেসিনের সামনে নিয়ে নাক চেপে রাখতে হবে। খ. রক্ত ভিতরে টেনে নেওয়া যাবে না। গ. ভেজা কাপড় দিয়ে নাক ২-৩ মিনিট চেপে রাখতে হবে। ঘ. নাক খোঁচানো বা পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২০২৫

চোখে ময়লা পড়লে	ক. চোখে পানির ঝাঁপটা দিতে হবে।
	খ. ময়লা বের করার জন্য চোখের পাতা টেনে পাতলা নরম কাপড় সরু করে ময়লা বের করতে হবে।
খিচুনি বা গিড়ার টান পড়লে	ক. রোগী যেভাবে আরাম বোধ করে সেভাবে রাখতে হবে। খ. বরফ/ঠান্ডা পানির সংস্পর্শে রাখতে হবে। গ. ব্যাথার স্থানে ব্যান্ডেজ দিয়ে রাখতে হবে।

এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।
- রোগীকে সতর্কতার সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে।
- রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

জব নং-০৪

জবের নাম: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৪.১ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহারের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৪.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।
৪.৩ কার্যক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করবে।
৪.৪ কার্যক্ষেত্রে জরুরি প্রক্রিয়াগুলোর যথাযথ অনুসরণ করবে।
৪.৫ দুর্ঘটনা, আগুন ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।
৪.৬ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কৌশল আয়ত্ব করবে।
৪.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৪.৮ চেকলিস্ট অনুযায়ী সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- বিভিন্ন ধরনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।
- কৃত্রিম আগুন ঘটিত দুর্ঘটনা।

কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে আগুন জ্বালাতে হবে।
- তারপর আগুন নেভানোর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আগুন নেভাতে হবে।

নিচে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নেভানোর পদ্ধতি উল্লেখ করা হল।

- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।
- ন্যূনতম ১.৮ মিটার দূর থেকে আগুনের দিকে মুখ করে দাড়াতে হবে।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি শক্ত করে ধরতে হবে এবং লক পিন খুলতে হবে।
- তারপর আগুনের উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।
- একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ঘুরিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করবে।
- সতর্কতার সাথে আগুন তৈরি করতে হবে।
- নিরাপদ কর্ম অভ্যাস মেনে চলবে।

জব নং-০৫

জবের নাম: কার্যস্থান/গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কৌশল।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৫.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৫.২ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করবে।

৫.৩ চেকলিস্ট অনুযায়ী ঝুঁকি সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৪ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণ সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৫ বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক যন্ত্রপাতি সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৬ বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিং এবং সেনিটাইজিং এজেন্ট সনাক্ত করতে পারবে।

৫.৭ কাজ শেষে স্টান্ডার্ড প্রক্রিয়া অনুসারে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করতে পারবে।

৫.৮ কাজ শেষে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- হ্যাজার্ড চেক লিস্ট
- বিভিন্ন ধরণের ব্রাশ
- উড ক্লিনার
- টাইল ও গ্রাউট ক্লিনার
- ডাস্টার বিভিন্ন ধরণের
- গ্লাস ক্লিনার
- মাইক্রো ফাইবার ক্লথ, মপ
- সাবান
- পানি
- অ্যামোনিয়া
- সাইট্রিক অ্যাসিড
- ক্লোরিন
- সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড
- আইডোফোরস
- আয়োডিন
- অ্যানায়নিক অ্যাসিড
- অ্যাসিটোন
- ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড পাউডার

কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে হ্যাজার্ড চেক লিস্ট অনুসারে ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং ঝুঁকি যথাযথ স্টান্ডার্ড অনুসারে অপসারণ করবে।
- প্লান্ট মেঝে/কার্যস্থান পরিষ্কার করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- ডাস্টবিন রুটিন মাফিক পরিষ্কার করতে হবে।
- স্যানিটাইজিং-এর পদ্ধতি :
  কর্মক্ষেত্রের ফ্লোর/স্থান স্যানিটাইজ করার কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো-
  ক. কেমিক্যাল বা স্যানিটাইজার প্রয়োগের মাধ্যমে।
  খ. গরম পানি ব্যবহার করে।
  গ. স্টিম বা গরম বাষ্প ব্যবহার করে।
  ঘ. উষ্ণ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে।

সাধারণত ক্লিনিং-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে এটি করতে হবে। স্যানিটাইজিং কেমিক্যালের সলিউশন বা দ্রবণ ক্লিন করা এরিয়াতে ছিটানো বা স্প্রে করতে হবে অথবা সলিউশন দিয়ে এরিয়া মুছে ফেলতে হবে।

এই জবটি চার বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।

- সতর্কতার সাথে ক্লিনিং/সেনিটাইজিং এজেন্ট তৈরি এবং ব্যবহার করতে হবে।
- সাবধানতার সাথে হ্যাজার্ড চিহ্নিত করবে।

অনুশীলনী-১

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. OSH এবং PPE এর পূর্ণরূপ কি?
২. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আগুন থেকে কত মিটার দূরে ধরতে হয়?
৩. হ্যাজার্ড বা আপদ কি?
৪. ঝুঁকি (Risk) কি?
৫. সুরক্ষা লক্ষণ ও প্রতীক কি?
৬. দূর্ঘটনা কি?
৭. প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) কি?
৮. আগুন সৃষ্টির মূল উপাদান কয়টি ও কি কি?
৯. পাঁচটি পরিষ্কারক যন্ত্রের নাম লেখ।
১০. পাঁচটি পরিষ্কারকের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. OSH এর বিধিসমূহ উল্লেখ কর।
২. বেসিক সেফটি ও সিকিউরিটি বলতে কি বোঝায়?
৩. OSH বলতে কি বোঝায়?
৪. পেশাগত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
৫. সুরক্ষা লক্ষণ ও প্রতীক এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
৬. পাঁচটি PPE এর নাম লেখ।
৭. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ কর।
৮. 5S বলতে কি বোঝায়?
৯. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির কারণগুলো উল্লেখ কর।
১০. 5S এর উদ্দেশ্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমূহ আলোচনা কর।
২. হ্যাজার্ড চেক লিস্ট কি? কর্মক্ষেত্রের জন্য একটি হ্যাজার্ড চেকলিস্ট তৈরি কর।
৩. PPE ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ১০ টি কারণ উল্লেখ কর।
৫. কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকারিতা উল্লেখ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি ফসল, খাদ্য ও পুষ্টি

Agricultural Crops, Food and Nutrition



খাদ্য জীবের জন্য অপরিহার্য। আমরা সাধারণত শরীরের ক্ষয়পূরণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি অর্জনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস হলো কৃষিজ দ্রব্য বা কৃষি ফসল। মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র পানি ও লবণই বাহির থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। বাকি সকল খাদ্য উপাদানের জন্য আমাদেরকে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কৃষি ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দানা শস্য যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা, কাউন ইত্যাদি মূলত শর্করা বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ থেকে আমরা প্রধানত আমিষ ও তেল জাতীয় খাদ্য উপাদান পেয়ে থাকি। টাটকা শাকসবজিতে আছে ভিটামিন, কিছু সহজলভ্য আমিষ ও খনিজ লবণ। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল থেকে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও বিবিধ খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়। সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, রেড়ি প্রভৃতি গাছের বীজ থেকে চর্বিজাতীয় উপাদান পাওয়া যায়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আমাদের দেশে উৎপাদিত কৃষি ফসল এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারব।
- বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

২.১ উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

উৎপাদন ক্ষেত্রভেদে: উৎপাদন ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও চাষাবাদের ধরণের উপর নির্ভর করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মাঠফসল বা কৃষিতাত্ত্বিক ফসল ও বাগান ফসল বা উদ্যান ফসল।

মাঠফসল: যে সমস্ত ফসল বৃহৎ পরিসরে মাঠে চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ ফসলের উপর কৃষকের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে তাকে মাঠ ফসল বলে। অর্থাৎ মাঠপর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষাবাদকৃত ফসলই হল মাঠ ফসল। যেমন- ধান, গম, ডাল, ভুট্টা, আখ, আলু ইত্যাদি।



চিত্র ২.১: মাঠ ফসল

২০২৫

বাগান বা উদ্যান ফসল: উদ্যান শব্দের অর্থ বাগান বা বাগিচা। বাগানে যেসব ফসল ফলানো হয় সেগুলোই উদ্যান ফসল। অর্থাৎ বাড়ির আশপাশে উঁচু স্থানে বা ছোট পরিসরের কোনো জমি বা বাগানে যত্নসহকারে যেসব ফসল ফলানো হয় তাকে উদ্যান ফসল বলে। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফলমূল, ফুল, মসলা ইত্যাদি উদ্যান ফসলের অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র ২.২: মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল।

উৎপাদন পদ্ধতিভেদে: উৎপাদন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- বৃষ্টি নির্ভর ফসল ও আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল।

বৃষ্টি নির্ভর ফসল: যেসব ফসল প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ করা হয় সেসব ফসলকে বৃষ্টিনির্ভর বা শুষ্ক ফসল বলে। যেমন- আউশ ও আমন ধান, গম, ডালশস্য, তেলবীজ, পাট, ভুট্টা, কাউন ইত্যাদি।

আর্দ্র বা সেচ প্রাপ্ত ফসল: যেসব ফসল সেচ ছাড়া চাষাবাদ করা যায় না সেগুলোকে সেচ প্রাপ্ত ফসল বলে। যেমন- উচ্চ ফলনশীল ধান, বোরো ধান, আলু, শীতকালীন সবজি যেমন- টমেটো, ঢেঁড়স, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক ইত্যাদি।

২.২ মৌসুমভিত্তিক কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

উৎপাদনের মৌসুমকে বিবেচনা করে কৃষি ফসলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- রবি ফসল ও খরিফ ফসল।

রবি ফসল: রবি ফসল মূলত শীতকালীন ফসল। আমাদের দেশে সাধারণত যে সকল ফসল শীতের শুরুতে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রোপণ করা হয় এবং শীতের শেষে বা গ্রীষ্মের শুরুতে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কাটা হয় তাদেরকে রবি ফসল বলা হয়। উপমহাদেশে রবি মৌসুম বলতে সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কেই বুঝায়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রবি ফসল হল আলু, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গম, যব, খেসারি, মসুর, ছোলা, সয়াবিন, সরিষা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

খরিফ ফসল: খরিফ ফসল হল গ্রীষ্মকালীন ফসল। যেসব ফসল সাধারণত গ্রীষ্মের শুরুতে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে রোপণ করা হয় এবং গ্রীষ্মের শেষে বা শীতের শুরুতে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে কাটা হয় তাদেরকে খরিফ ফসল বলে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে খরিফ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- খরিফ-১ (মার্চ-জুন) ও খরিফ-২ (জুলাই-অক্টোবর)। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান খরিফ ফসল হল ধান, ভুট্টা, পাট, জোয়ার ও বাজরা, তিল, তিসি, গ্রীষ্মকালীন সবজি ইত্যাদি।

২.৩ ব্যবহারভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ

এক্ষেত্রে সাধারণত ফসলের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে ফসলগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ব্যবহার ভেদে কৃষি ফসল প্রায় ১২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- **দানা জাতীয় শস্য (Cereals):** ধান, গম, যব, ভুট্টা, কাউন ইত্যাদি।
- **ডাল জাতীয় শস্য (Pulses):** ছোলা, মসুর, মুগ, মটরশুটি, মাষকলাই, শিম, অড়হর ইত্যাদি।
- **তেলবীজ (Oils):** সরিষা, নারিকেল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, তিল ইত্যাদি।
- **চিনি ফসল (Sugar crops):** এ জাতীয় ফসলের মধ্যে আঁখ (Sugarcane) ও বীটই প্রধান।
- **আঁশ বা তন্তুজাতীয় ফসল (Fibre crops):** তুলা, পাট, মেস্তা, শণ, তিসি ইত্যাদি।
- **নেশা বা মাদকজাতীয় ফসল (Narcotics):** তামাক, আফিম, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি।
- **সবজি জাতীয় ফসল (Vegetables):** বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, ইত্যাদি।
- **পানীয় ফসল (Beverages):** এ ফসলগুলো হচ্ছে চা ও কফি।
- **পশু খাদ্য (Fodder crops):** নেপিয়ার ঘাস, ইপিল-ইপিল, ভুট্টা ইত্যাদি।
- **সবুজ সার জাতীয় ফসল (Green manure crops):** ধৈঞ্চা, শণ, পাট ইত্যাদি এ জাতীয় ফসল।
- **মসলা জাতীয় ফসল (Spices crops):** পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া, লবঙ্গ, দারুচিনি, জিরা, তেজপাতা ইত্যাদি।
- **ফল জাতীয় ফসল (Fruit crops):** আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি।

২.৪ পুষ্ট ও অপুষ্ট দানা ও অপদ্রব্য

পুষ্ট দানা: যে সকল কৃষি ফসল ত্রুটিমুক্ত, ভালো গুণসম্পন্ন এবং পুনরায় ফসল উৎপাদনে সক্ষম সেই সকল কৃষি ফসলকে পুষ্ট দানা বলে।



চিত্র ২.৩: পুষ্ট দানা

অপুষ্ট দানা: যে সকল কৃষি ফসল ত্রুটিযুক্ত, ভাঙ্গা, ফাটা, অস্বাভাবিক এবং পুনরায় ফসল উৎপাদনে সক্ষম নয় সেই সকল কৃষি ফসলকে অপুষ্ট দানা বলে।

অপদ্রব্য: কৃষি ফসলের সাথে মিশ্রিত খড়কুটা, ডাল-পাতা, খোসা, ধুলা-বালি, নুড়ি-পাথর, পশু-পাখির বিষ্ঠা, বিভিন্ন ধরণের পোকা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে অপদ্রব্য বলে।



চিত্র ২.৪: অপুষ্ট দানা

২.৫ খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য: যে সব খাদ্যবস্তু খেলে জীবদেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় তাদেরকে খাদ্য বলে। যেমন- ভাত, ডিম, দুধ, মাংস, রুটি, তেল, বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি ইত্যাদি।

পুষ্টি: পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়া দ্বারা জীবদেহে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও পরিশোষিত হয়ে সমস্ত দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে ও দেহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে তাকেই পুষ্টি বলে।

২.৬ খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব খাদ্য খাই তাদেরকে উৎস, কার্যকারিতা ও পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল।

- উৎস অনুসারে খাদ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা-
  উদ্ভিজ্জ খাদ্য: যেমন- চাল, গম, ডাল, ফল, শাকসবজি ইত্যাদি।
  প্রাণীজ খাদ্য: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি।
- কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্যবস্তুকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
  দেহ গঠনকারী খাদ্য: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি।
  শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য: যেমন- ভাত, রুটি, স্নেহ জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।
  রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য: যেমন- ফলমূল ও শাকসবজি।
- পচনশীলতার উপর ভিত্তি করে খাদ্যদ্রব্যকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-
  পচনশীল খাদ্য: যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, বিভিন্ন ধরনের শাক ইত্যাদি।
  অর্ধ পচনশীল খাদ্য: যেমন- আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি।
  অপচনশীল খাদ্য: যেমন- চাল, ডাল, বিভিন্ন ধরনের শুকনা বীজ ইত্যাদি।

২.৭ খাদ্যের উপাদান ও কাজ

খাদ্যের উপাদানগুলোকে সাধারণত ০৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- শর্করা বা শ্বেতসার (Carbohydrate)
- আমিষ (Protein)
- স্নেহ বা চর্বি (Fat)
- খনিজ লবণ (Minerals)
- খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)
- পানি (Water)

শর্করা: আমাদের দেহে শক্তি উৎপাদনকারী প্রধান খাদ্য উপাদান হল শর্করা। দেহে শর্করার চাহিদা পূরণের জন্য আমরা সাধারণত ভাত, রুটি, আলু, যব, মিষ্টি আলু ইত্যাদি খেয়ে থাকি। আমাদের দেহে শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল কাজগুলো হল-

- শরীরে শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে। (১ গ্রাম শর্করা হতে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়)।

- আমিষ ও চর্বি সংশ্লেষে অংশগ্রহন করে ।
- স্বল্প আমিষযুক্ত খাদ্যকে তাপ উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দেয়।
- শাকসবজিতে সঞ্চিত সেলুলোজ কোষ্টবদ্ধতা দূর করে।
- কিছু শর্করা রক্তের কোলেস্টরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
- অতিরিক্ত শর্করা শরীরে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।
- যকৃৎ ও পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন প্রয়োজনে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

আমিষ: আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান হলো আমিষ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে আমিষের উৎসগুলো হল- মাছ, মাংস, ডাল, দুধ, ডিম ইত্যাদি। মানবদেহে আমিষ জাতীয় খাদ্যের মূল কাজ হলো-

- দেহ কোষ গঠন, দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা।
- অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করা।
- মাতৃস্তনে দুধ উৎপাদনে আমিষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- দেহে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসয়নিক বিক্রিয়ায় সহায়ক হিসাবে এনজাইম বা উৎসেচক সৃষ্টি করা।
- দেহে শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য উপাদানের ঘাটতি হলে আমিষই শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। (১ গ্রাম আমিষ হতে ৪ কিলোক্যালোরি তাপশক্তি পাওয়া যায়) ।

স্নেহ বা চর্বি: তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে স্নেহ পদার্থ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে স্নেহ জাতীয় উপাদানের উৎস হল রান্নায় ব্যবহৃত তেল, ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস ও দুধে বিদ্যমান চর্বি ইত্যাদি। স্নেহ জাতীয় পদার্থের মূল কাজ হল-

- জীবদেহে শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে।(১ গ্রাম চর্বি থেকে ৯কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়)।
- তেল বা চর্বি তাপের কুপরিবাহী বলে দেহকে গরম রাখে।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ যেমন- ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি ও ভিটামিন কে পরিশোষণে দেহকে সহায়তা করে।
- উদ্ভিজ্জ তেলের অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড ত্বক ও কোষের সুস্থতা রক্ষা করে।
- খাদ্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থের ব্যবহারের ফলে তা সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়।

খনিজ লবণ: প্রতিদিন ভাত ও তরকারির সাথে আমরা যে লবণ খাই সেটা ছাড়াও প্রকৃতিতে আরও অনেক ধরনের লবণ আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের দেহকোষের গঠন ও দেহে তরলের সমতা রক্ষার জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সঙ্গে দেহে ২০২৫
প্রবেশ করে এবং দেহ গঠনে সাহায্য করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের

প্রধান উৎস।। শরীরের জন্য অত্যাবশকীয় খনিজ পদার্থগুলো হলো- ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, আয়োডিন ইত্যাদি। আমাদের দেহে খনিজ পদার্থের কাজগুলো নিম্নরূপ-

- মানব দেহের হাড় ও দাঁতের গঠনে সহায়তা করে।
- হরমোন, এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে।
- রক্তের হিমোগ্লোবিন বা লাল রক্ত কণিকা তৈরি করে।
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ করে।
- থাইরয়েড গ্রন্থি ও বিপাকের কাজ সম্পন্ন করে।
- স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রন করে।
- দেহের প্রতিটি কোষে রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে।
- দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা করে।
- হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

ভিটামিন: যে সকল জৈব খাদ্য উপাদান দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে ভিটামিন বলে। বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং শরীরের জন্যও খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিনগুলো হল- ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই ও ভিটামিন কে। এসব ভিটামিন আমরা সাধারণত প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যবস্তু যেমন- বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি হতে পেয়ে থাকি।
পানি বা চর্বিতে দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- **চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে।
- **পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।

মানব দেহে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিনের কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে চোখের কর্মক্ষমতা রক্ষা করে এবং ত্বকের কোমলতা স্বাভাবিক রাখে।
- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দেহের বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখে, রক্তকোষ গঠন করে, স্নায়ু কোষ সুস্থ রাখে ও বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে।
- ভিটামিন সি রক্ত কোষ গঠন করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে। ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।
- ভিটামিন ডি খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণের মাধ্যমে দেহের হাড় গঠনে সহায়তা করে। ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেট ও বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়ে থাকে।
- ভিটামিন ই স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ, বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ, ভ্রূণের বৃদ্ধি ইত্যাদিতে সাহায্য করে।

- ভিটামিন কে রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিক রাখে এবং শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

পানি: পানি হলো একটি অজৈব, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং প্রায় বর্ণহীন এক রাসায়নিক পদার্থ, যা পৃথিবীর বারিমন্ডলের ও যে কোন জীবকোষ বা উদ্ভিদ কোষের একটি প্রধান উপাদান। তাই পানির অপর নাম জীবন। বিভিন্ন প্রকার ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, ডাব, তরমুজ, পেঁপে, আনারস, জাম্বুরা ইত্যাদি এবং শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে ৫০-৬৫% (গড়ে ৫৭-৬০%) পানি থাকে। শরীরে পানির ঘাটতি হলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। মানব দেহে পানির প্রধান কাজগুলো হল-

- খাদ্য পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করা।
- বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশণ করা।
- ঘাম নিঃসরণ ও বাষ্পীভবনের দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা।

২.৮ বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খাদ্য

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিতভাবে সুষম খাদ্যগ্রহণ করা অপরিহার্য। তবে সব বয়সের মানুষ একই ধরনের খাবার গ্রহণ করতে পারে না। তাই শিশু, পূর্ণ বয়স্ক ও বৃদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।

সুষম খাদ্য: যেসব খাদ্যের মধ্যে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি পরিমাণমত বিদ্যমান থাকে তাদেরকে সুষম খাদ্য বলে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বয়স, চাহিদা ও পরিশ্রম অনুযায়ী সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত খাদ্য তালিকায় যত বেশি রকমের খাদ্যবস্তুর সমন্বয় করা যায় খাদ্য তত বেশি সুষম হয়। একজন লোক কোন ধরণের খাদ্য কি পরিমাণে খেলে তা সুষম হবে তা নির্ভর করে তার বয়স, পেশা, লিঙ্গ এবং শারীরিক অবস্থার ওপর। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সুষম খাদ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

১. চাল বা গম + ডাল + শাক (পুঁইশাক/পালংশাক/ডাটা) বা সবজি (টমেটো, শিম, বরবটি, ফুলকপি, লাউ, করলা ইত্যাদি)।

২. চাল বা গম + ডাল + সামান্য মাছ + শাকসবজি।

৩. মায়ের দুধ (শিশুর জন্য সুষম খাদ্য) ।

৪. চাল বা গম + মাংস + শাকসবজি ।

৫. চাল বা গম + গরুর দুধ।

১.৯ বিভিন্ন বয়সের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা

- **০-৬ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য:** ০-৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য মায়ের দুধই উৎকৃষ্ট খাদ্য। ৫ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর সব পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে।

- **৬-১২ মাসের শিশুর দৈনিক খাদ্য তালিকা:** ৬-১২ মাস বয়সী শিশুদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি নিচের খাদ্যগুলো খাওয়াতে হবে।

খাবার	পরিমাণ	খাবার	পরিমাণ
নরম ভাত	৪৫ গ্রাম (চাল)	দুধে ভেজানো রুটি	৫০ গ্রাম
ডাল (নরম খিচুড়ি করে)	১০ গ্রাম (২ চা চামচ)	আলু (চটকানো)	১ টি ছোট
শাকসবজি (ভাতের সাথে)	৬০ গ্রাম	পাকা কলা	১টি ছোট
ডিম (সম্ভব হলে)	১টি		

- **১৪-১৮ বছরের ছেলে-মেয়েদের দৈনিক খাদ্য তালিকা:** ১৪-১৮ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের দৈনিক নিচের খাদ্যগুলো খাওয়া উচিৎ।

খাবার	পরিমাণ	খাবার	পরিমাণ
চাল/আটা	৪৫০ গ্রাম	মিষ্টি আলু/গোল আলু	১২৫ গ্রাম
ডাল	১০০ গ্রাম	তেল	৬০ গ্রাম
শাক	৯০ গ্রাম	ফল	১টি
দুধ	২৫০ মি.লি.	চিনি/গুড়	৬০ গ্রাম
মাছ/মাংস/ডিম	৮০ গ্রাম	অন্যান্য সবজি	৯০ গ্রাম

- **গর্ভবতী মায়ের জন্য দৈনিক খাদ্য তালিকা:** একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য প্রতিদিন নিচের খাদ্যগুলো গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খাবার	পরিমাণ	খাবার	পরিমাণ
চাল/আটা	৪৫০ গ্রাম	ফল	১টি
ডাল	১০০ গ্রাম	দুধ	২৫০ মি.লি.
শাক	৯০ গ্রাম	চিনি/গুড়	৩০ গ্রাম
মিষ্টি আলু/গোল আলু	২০০ গ্রাম	মাছ/মাংস/ডিম	৬০ গ্রাম
তেল	৬০ গ্রাম	সবজি	১০০ গ্রাম

২.৯ বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতি

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন ধরণের অপুষ্টিতে ভোগে। বাংলাদেশে প্রধানত মা ও শিশুরাই বেশি অপুষ্টিতে ভোগে থাকে। এদেশে মায়েদের এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্টির শিকার এবং তাদের উচ্চতার তুলনায় ওজন বেশ কম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারীর পুষ্টিহীনতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০% এর বেশি নারী পুষ্টিহীনতার শিকার। পৃথিবীর যে দেশগুলোতে অপুষ্টিজনিত সমস্যা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় অর্ধেকই অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং ৫

২০২৫

বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রায় ৫০% এর মৃত্যুর মূল কারণ হল পুষ্টিহীনতা। শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণেই এখনও বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ২০০ শিশু মারা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রধান পুষ্টি সমস্যা ও সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নের ছকে দেওয়া হলো-

ক্রমিক নং	সমস্যা	কারণ
১.	অসম খাদ্য বণ্টন	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অসমতা, ফলে অসম খাদ্য বণ্টন, খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ, খাদ্য অপচয় ও খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করে।
২.	ক্যালরি গ্রহণ হ্রাস	মাথাপিছু প্রতিদিন ২৩০১ কিলোক্যালরি থেকে ১৯৬১ কিলোক্যালরিতে নেমে গেছে।
৩.	শিশুর অপুষ্টি	৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টিতে আক্রান্ত। শিশু মৃত্যুর হার বেশি, শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মায় অর্থাৎ জন্মকালীন ওজন ২.৫ কেজিরও কম। অল্প বয়সে বিবাহ, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, মায়ের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি শিশুর অপুষ্টির প্রধান কারণ।
৪.	মায়ের অপুষ্টি	প্রতি ১০০০ সন্তান জন্মদানে ৫৬ জন মা গর্ভকালীন জটিলতায় মারা যায়। দৈহিক ক্লেশ, অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, কুসংস্কার, মায়ের অপুষ্টির প্রধান কারণ।
৫.	রক্তস্বল্পতা	মহিলা, গর্ভবতী মহিলা এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে। কৃমি রোগ, আমাশয়, আমিষ ও লৌহের ঘাটতি, ঘন ঘন সন্তান জন্মদান, রক্ত স্বল্পতার প্রধান কারণ।
৬.	ভিটামিন 'এ' এর অভাব	প্রতি বছর ৩০,০০০ শিশু ভিটামিন এ এর অভাবে অন্ধ হয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু অন্ধ হয়ে পড়ার পর মারা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিটামিন এ সমৃদ্ধ শাকসবজি খাওয়ানো হচ্ছে না, রান্নায় তেল ব্যবহার খুবই অল্প, শাল দুধ ফেলে দেওয়া ইত্যাদি।
৭.	আয়োডিনের অভাব	৬৯% জনগণের মধ্যে আয়োডিনের অভাব। ৪৭% জনগণের মধ্যে গলগন্ড দেখা গেছে। ৫ লক্ষ লোক আয়োডিনের অভাবে মানসিক প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ। মাটি, পানি ও খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি এর অন্যতম কারণ।
৮.	অন্যান্য অণু পুষ্টি উপাদানের অভাব	ফলিক এসিড, রিভোফ্লাভিন এবং দস্তা ইত্যাদি অনুখাদ্যের অভাব কিশোরী মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। আমিষ খাদ্যের স্বল্পতা, পেটের অসুখ প্রভৃতিতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল সনাক্তকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।

১.২ বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল সনাক্তকরণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ কৃষি ফসল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ বিভিন্ন প্রকার কৃষি ফসল সনাক্ত করবে।

১.৫ কাজ শেষে কার্যস্থান পরিষ্কার করবে।

১.৬ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুযায়ী যথাস্থানে কৃষি ফসল সংরক্ষণ করবে।

১.৭ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- হ্যান্ড গ্লোভস
- সেফটি স্যু
- হেলমেট
- মাস্ক
- সেফটি গগলস

প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুলস

- ম্যানুয়াল
- ট্রে/ডিস
- চিমটা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- শর্করা জাতীয় ফসল: ধান, গম, ভুট্টা, যব, চিনা, কাউন, আখ, তাল, খেজুর প্রভৃতি।
- স্নেহ জাতীয় ফসল: সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম প্রভৃতি।
- মশলা জাতীয় ফসল: হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি।

২০২৫

কার্যপদ্ধতি

- কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE-Personal Protective Equipment) পরিধান করতে হবে।
- বিভিন্ন কৃষি ফসল সংগ্রহ করতে হবে।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী ম্যানুয়াল, টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
- ট্রে/ডিসে বিভিন্ন কৃষি ফসল নিয়ে সেই ফসল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে এবং কোনটা কোন ধরনের ফসল তা চিহ্নিত করে আলাদা করবে এবং ফসলের নাম খাতায় নোট করবে।
- কৃষি ফসল আলাদা করে জারে ভরে জারের গায়ে নাম লিখে ল্যাবে সংরক্ষণ করবে।
- কৃষি ফসল শনাক্ত করা হয়ে গেলে টুলস ও ইকুইপমেন্ট পরিষ্কার করে যথাস্থানে রাখতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম খুলে ভালো করে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে।

এই জবটি বিভিন্ন ধরনের ফসল ব্যবহার করে পাঁচবার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- শর্করা, স্নেহ ও মশলা জাতীয় ফসল আলাদা আলাদা ট্রে/ডিসে নিয়ে সনাক্ত করব।
- খুব সাবধানতার সাথে কৃষি ফসল সনাক্ত করব।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করব।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করব।

অনুশীলনী-২

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মৌসুম ভিত্তিক ফসল কত প্রকার?
২. কয়েকটি শর্করা জাতীয় খাদ্যের নাম লেখ?
৩. মাঠফসল কাকে বলে?
৪. উদ্যান ফসল কাকে বলে?
৫. আমাদের দেশের তেল জাতীয় ফসলগুলো কী কী?
৬. আঁশ জাতীয় ফসল কী কী?
৯. শর্করা কি?
১০. আমিষ কি?
১১. ভিটামিন কত প্রকার ও কী কী?
১২. ভিটামিন এ এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৩. ভিটামিন বি এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৪. ভিটামিন সি এর অভাবে কি রোগ হয়?
১৫. ভিটামিন ডি এর অভাবে কি রোগ হয়?

১৬. ভিটামিন কে কি কাজ করে?

১৭. প্রতিদিন তোমার কতটুকু দুধ পান করা উচিৎ?

১৮. পুষ্ট দানা কি?

১৯. অপুষ্ট দানা কি?

২০. অপদ্রব্য কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রবি ফসল কাকে বলে? কয়েকটি রবি ফসলের নাম লিখ।

২. খরিফ ফসল কাকে বলে? কয়েকটি খরিফ ফসলের নাম লিখ।

৩. খাদ্যের মূল উপাদান কয়টি ও কি কি?

৪. মানবদেহে শর্করার কাজ কী?

৫. মানবদেহে আমিষের কাজ কী?

৬. আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ উপাদানগুলো কী কী?

৭. মানবদেহে স্নেহজাতীয় পদার্থের কাজ কি?

৮. মানবদেহে খনিজ লবণের কাজ কি?

৯. মানবদেহে ভিটামিন এ এর কাজ কি?

১০. মানবদেহে পানির কাজ কি?

১১. আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যকে সুষম করতে হলে কি করতে হবে?

১২. খাদ্যে আমিষ ও শর্করার উৎসগুলো কি কি?

১৩. খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খনিজ লবণের উৎস কি কি?

১৪. মানব দেহে ভিটামিন ই এর কাজ কি ?

১৫. মানব দেহে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর কাজ কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবহার ভেদে কৃষি ফসলের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. খাদ্যের উপাদানগুলোর কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩. কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. সুষম খাদ্য কী? ১৪-১৮ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর।

৫. ০-৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য সুষম খাদ্য কোনটি? একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর।

৬. বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

ধানের পরিচিত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

Introduction to Rice, Processing and Storage



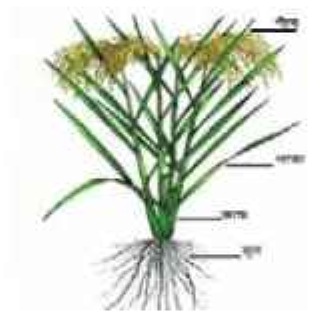
ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং সারা বিশ্বে এটি দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। ধান গাছ মূলত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি ধান উৎপন্ন হয়। তবে দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশালে সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়। বিশ্বব্যাপী ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে- চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ভুটান, কেনিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, নেপাল, জাপান, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়। ধানবীজ বা চাল সুপ্রাচীনকাল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রধান খাদ্য।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ধানের মিলিং এবং মিলিং মেশিন সম্পর্কে জানতে পারব।
- গোলাজাত শস্যের সংরক্ষণ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারব।
- ধান ও চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারব।

৩.১ ধানের পরিচিতি

ধান হল অতি পরিচিত একটি ঘাস জাতীয় একবীজপত্রী উদ্ভিদ। ধান গাছ সাধারণত ১-১.৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এর পাতা সরু ও লম্বা আকৃতির হয়। পাতা ৫০-১০০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা ও ২-২.৫ সে.মি. প্রশস্ত হয়ে থাকে। সাধারণত বায়ুর সাহায্যে এর পরাগায়ন হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জরীতে ফুলগুলো ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাজানো থাকে। ধান গাছের বীজকেই প্রধানত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.১: একটি আদর্শ ধান গাছ

৩.১.১ ধানের সংজ্ঞা

ধান হল এক ধরনের তন্ডুল বা দানা জাতীয় ফসলের পরিপক্ব ডিম্বাশয় বা ফল। এটি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি ধানে একটি করে বিচি বা বীজ থাকে যার বীজপত্রও একটি। তাই ধান এক ধরনের একবীজপত্রী উদ্ভিদ।

চাল: ধানের খোসা সরানোর পর যে সস্যল বা দানাদার অংশ পাওয়া যায় তাকে চাউল বা চাল বলে। চাল রান্না করলে ভাত হয়। চালে সাধারণত ৭৯% শর্করা, ৬.৪% আমিষ, ০.৪% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে। ভাত বা চাউল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মূলত শর্করার চাহিদা পূরণের জন্যই খাওয়া হয়।

৩.১.২ ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন

চাষাবাদের সময়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান উৎপন্ন হয়। যেমন-

আউশ ধান: এই ধানের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ৩০ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল এবং ধান কাটার উপযুক্ত সময় ৩০ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশে আউশ ধানের যে জাতগুলো সচারাচর পাওয়া যায় সেগুলো হল আটলাই, কটকতারা, কুমারী, চারনক, দুলার, ধলাষাইট, ধারাইল, পটুয়াখালী, পশুর, পানবিড়া, পাষপাই, পুখী, মরিচবেটি, হরিণমুদা, হাসিকলমি, সূর্যমুখ, শনি, ষাইটা, ভৈরা, শঙ্কপটি, কালাবকরি, খড়াজামড়ি, মুলকে আউশ, কালামানিক, ভাতুরি ইত্যাদি।

আমন ধান: শীতকালীন ধানকে বাংলাদেশে আমন ধান বলা হয়। এর অপর নাম আগুনী ও হৈমন্তিক। রোপা আমনের রোপণ সময় হচ্ছে ১৫ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট। আমন ধান কাটার উপযুক্ত সময় ১৫ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আমন ধান তিন প্রকার। যথা-

রোপা আমন : চারা প্রস্তুত করে রোপণ করা হয়।

আছরা/বোনা আমন : এই ধান ছিটিয়ে বোনা হয়।

বাওয়া আমন : বিল অঞ্চলে এই আমন উৎপন্ন করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির ধানের স্থানীয় নাম রয়েছে। যেমন- ইন্দ্রশাইল, কাতিবাগদার, ক্ষীরাইজালি, গদালাকি, গাবুরা, চিংড়িখুশি, চিটবাজ, জেশোবালাম, ঝিঙ্গাশাইল, ঢেপি, তিলককাচারী, দাউদিন, দাদখানি, দুদলাকি, দুধসর, ধলা আমন, নাগরা, নাজিরশাইল, পাটনাই, বাঁশফুল, বাইশ বিশ, বাদশাভোগ, ভাসা মানিক, মালিয়াডাক্র, রাজাশাইল, রূপশাইল, লাটশাইল, হাতিশাইল ইত্যাদি।

বোরো ধান: সাধারণত নিচু জমিতে এই ধানের চাষ করা হয়। বোরো মূলত রোপণ করে চাষ করা হয়। সে কারণে একে রোপা ধান হিসাবেও কোনো কোনো অঞ্চলে অভিহিত করা হয়। তবে বসন্তকালে এই ধান জন্মে বলে একে বাসন্তিক ধানও বলা হয়। বোরো ধান রোপণের উপযুক্ত সময় অক্টোবর-নভেম্বর এবং ধান কাটার সময় এপ্রিল-জুন মাস। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বোরো ধানগুলো হল- আমন বোরো, খৈয়াবোরো, টুপা, পশুশাইল, বানাজিরা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন নিম্নের ছকে দেয়া হলো।

সারণি-১ : বিভিন্ন ধানের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য ও গড় ফলন

ক্রমিক নং	ধানের জাত	জাতের ধরন	মৌসুম	জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ	গড় ফলন হেক্টর প্রতি (টন)
১.	বিআর-১ (চান্দিনা)	উচ্চ ফলনশীল	বোরো	চাল খাটো, মোটা	৫.৫
			আউশ	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৪.০
২.	বিআর-৬	উচ্চ ফলনশীল	বোরো	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৪.৫
			আউশ		৩.৫
৩.	ব্রি ধান-২৭	উচ্চ ফলনশীল	আউশ	চাল মাঝারি মোটা, বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	৪.০
৪.	ব্রি ধান-৩১	উচ্চ ফলনশীল	আমন	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০
৫.	ব্রি ধান-৫৬	খরা সহিষ্ণু	রোপা আমন	চাল লম্বা মোটা, সাদা, খরা সহিষ্ণু	৪.০-৪.৫
৬.	ব্রি ধান-৫৭	খরা পরিহারকারী	রোপা আমন	চাল জিরাশাইল এবং মিনিকিট চালের মত, খরা সহিষ্ণু	৪.০
৭.	ব্রি ধান-৫৮	উচ্চ ফলনশীল	বোরো	দানা আনেকটা ব্রি ধান২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন	৭.২
৮.	বঙ্গবন্ধু ধান-১০০	জিংক সমৃদ্ধ	বোরো	চাল মাঝারি চিকন এবং রং সাদা	৭.৭
৯.	ব্রি হাইব্রিড ধান-১	হাইব্রিড	বোরো	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৮.৫
১০.	ব্রি হাইব্রিড ধান-৪	হাইব্রিড	রোপা আমন	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৬.৫

৩.১.২ ধানের বিভিন্ন অংশ ও পুষ্টিমান

ধানের বিভিন্ন অংশ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

- **তুষ (Husk):** এটি ধানের খসখসে ও শক্ত বহিরাবরণ যা চাউলকে রক্ষা করে।
- **কুঁড়া (Bran):** চালের বহিরাবরণকে কুঁড়া বলে। ধানের তুষ বের করে নেওয়ার পর চাল বা দানার উপরের লালচে ও খুবই পাতলা আবরণ ছাঁটাই করলে তা কুঁড়া হয়ে বেরিয়ে আসে।
- **অ্যালিউরণ (Aleurone) স্তর:** তুষ ও কুঁড়া বের করে নেওয়ার পরও চালের উপর হালকা বাদামি রঙের গুঁড়ার মতো যে স্তরটি থাকে তাকে অ্যালিউরণ স্তর বলে। অ্যালিউরণ স্তরে প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। ঢেঁকিতে ভানলে চালের অ্যালিউরণ স্তর থেকে যায় কিন্তু মেশিনে ভাঙ্গালে তা থাকে না।

- **সস্য (Endosperm):** ধানের মূল দানাই হচ্ছে সস্য বা এন্ডোসপার্ম। এটি ধানের ৭৫ ভাগ অংশ এবং খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- **ভ্রূণ (Embryo):** চালের দানার নিম্ন প্রান্তে অর্থাৎ বোঁটার দিকের প্রান্তে ভ্রূণ অবস্থিত। চাউলে বিদ্যমান ভিটামিনগুলো বেশিরভাগই ভ্রূণে থাকে।

চালের পুষ্টিমান: চালের পুষ্টি উপাদানের মধ্যে ৮০ ভাগই শর্করা যা চালের ভিতরের দিকে বা কেন্দ্রে থাকে। কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো-

সারণি-২ : চালের পুষ্টিমান (গ্রাম/১০০গ্রাম)

চাষ ও তুষ	শর্করা	প্রোটিন	পানি	চর্বি	আঁশ	খনিজ পদার্থ
ঢেঁকি ছাঁটা চাল	৮০	৬.৫-১৬	১১.৬১	১.৭-৩.৫	০.২-২.৬	১.২
কলে ছাঁটা চাল	৮০	৭.৬	১১.৪১	০.৫	০.২	০.৫
তুষ	-	১৫.৫	০.৫-১	২০.০	১২.৫	১২

৩.১.৪ ধানের ব্যবহার বিধি

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হল ভাত। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাল বা চাউলজাত খাদ্যদ্রব্য। শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ৮০ ভাগই হলো চাল বা ভাত। ধান বা চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা যায়। যেমন-

মানুষের খাদ্য-

- ভাত
- চিড়া
- খৈ, খৈ এর মোয়া ও মুড়কি
- মোয়া ও মুড়কি
- জাউ ভাত
- পোলাও ও বিরিয়ানি
- খিচুড়ি
- মুড়ি, মিষ্টিমুড়ি ও ঝালমুড়ি
- বেকারিতে বিভিন্ন খাদ্যে চালের গুঁড়ি ব্যবহার
- চালের আটা বা গুঁড়ি (রুটি ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরির জন্য) ইত্যাদি।

পশুপাখির খাদ্য-

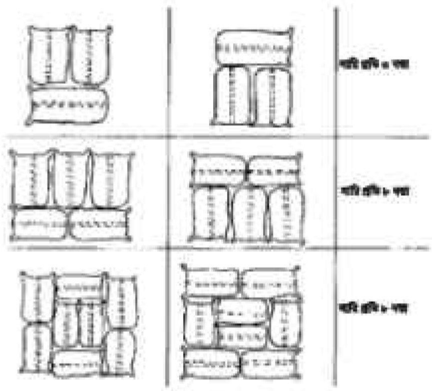
- ধানের কুঁড়া
- ভাঙ্গা চাল
- ধানের খড়

৩.১.৫ ধান সংরক্ষণ পদ্ধতি

ধান কাটার পর সাধারণত রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা কমিয়ে ১২-১৪% এ আনা হয়। তারপর প্যাকেটজাত করে অথবা খোলা অবস্থায় গোলা ঘরে বা সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়। ধান সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল সারা বছর খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা, পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের জন্য বীজের জীবনীশক্তি অটুট রাখা, কাঙ্ক্ষিত দামে বিক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করা এবং দুর্যোগকালে খাদ্যঘাটতি মেটানো।

ধান বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা-

- **খামারবাড়িতে সংরক্ষণ:** খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বেশির ভাগ ধান বা দানাশস্য খামারের ভিতরেই গুদামজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য যেসব পাত্র ব্যবহার করা হয় তা হল- চটের বস্তা, কাঠের বাক্স, বাঁশের ঝুড়ি বা ডোল ও ড্রাম।
- **ফসলের গোলায় সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ধান গুদামজাত করার জন্য ছোট আকারের কাঠামো তৈরি করা হয়। যেমন- কাঠ, বাঁশ, ধাতব শিট বা সিমেন্টের ঢালাই ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গোলা।



চিত্র ৩.২: গুদামে ধানের বস্তা সাজানো

- **পাকা গুদামে সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে সাধারণত চালের মিলে এবং সরকারি সংস্থায় পাকা গুদামে রেখে ধান বা চাউল সংরক্ষণ করা হয়।
- **ঢালাও গুদামে সংরক্ষণ:** এ ক্ষেত্রে সাধারণত শস্যদানা গুদাম ঘরের মেঝেতে স্তূপাকারে রাখা হয়। তবে আলো-বাতাস চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হয়।



চিত্র ৩.৩: সাইলো

- **সাইলোতে (Silo) সংরক্ষণ:** খাদ্য মন্ত্রণালয় দীর্ঘ সময় ধরে ধান বা চাল সংরক্ষণের জন্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গুদাম তৈরি করে রাখে তাকে সাইলো বলে। এসব সাইলোতে কীটনাশকমুক্ত মজুত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই থেকে তিন বছর খাদ্য শস্যের পুষ্টিমান বজায় রেখে সংরক্ষণ করা সম্ভব। আমাদের দেশে এই সকল সাইলোর মাধ্যমে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংরক্ষিত শস্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

৩.১.৬ গোলাজাত ধানে পোকামাকড় চিহ্নিতকরণ ও দমন ব্যবস্থা

ধানের গোলাজাত পোকামাকড়: প্রায় ৫০ ধরনের পোকামাকড় আমাদের দেশে গোলাজাত শস্যের ক্ষতিসাধন করে থাকে। পরিবেশগত দিক থেকে পোকামাকড়ের অবস্থা ও বংশ বিস্তারের জন্য বাংলাদেশ মোটামুটিভাবে উত্তম স্থান। এখানে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে পোকামাকড় দ্রুত বংশবিস্তার করে। ফলে গুদামজাত শস্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে পোকাক্রান্ত হয় । নিম্নে গুদামজাত ধানে আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকামাকড়ের পরিচিতি ও ক্ষতির প্রকৃতি বর্ণনা করা হলো-

- **ধানের শুঁড় পোকা:** এই পোকা শস্যের মধ্যে গর্ত করে শস্যের শাঁস খেয়ে ফেলে। বাংলাদেশে এই পোকা বর্ষাকালে বিশেষ করে আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত গোলাজাত ধানের বেশি ক্ষতি করে থাকে।
- **কেড়ি পোকা:** এই পোকা সাধারণত ধান ও গম ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। এদের চোয়াল অত্যন্ত শক্তিশালী। চোয়ালের সাহায্যে এরা শস্যদানার ভেতরের অংশ কুরে কুরে খায়।। খাওয়ার ফলে শস্যদানার ভেতরের অংশ ফাঁপা হয়ে যায় এবং শুধু বাইরের খোঁসাটি অবশিষ্ট থাকে।



চিত্র ৩.৩: ধানের ক্ষতিকারক পোকা

- **লাল শূসরী পোকা:** এদের শরীর দেখতে লাল ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়েই গুদামজাত শস্যদানা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যে আক্রমণ করে। সাধারণত এরা অক্ষত বা পূর্ণ দানায় আক্রমণ করে না। পোকায় আক্রান্ত ময়দা, সুজি ও আটা একসাথে দলা বেঁধে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।
- **খাপড়া বিটল:** গুদামজাত শস্যের জন্য এটি একটি মারাত্মক পোকা। এ পোকা না খেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। এরা গুদামজাত শস্যের উপরের স্তরে আক্রমণ করে এবং ধানের বেশি ভিতরে ঢোকে না।
- **ধানের সুরুই পোকা:** এ পোকার কীড়া ধানের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে থাকে। আক্রান্ত ধানের মধ্যে এরা গোলাকার ছিদ্র করে খায়। সাধারণত এরা ধানের উপরের স্তরের বেশি ক্ষতি করে থাকে।
- **চালের সুরুই পোকা:** এই পোকা ধানের সুরুই পোকা থেকে একটু বড়। এ পোকা চালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কীড়াগুলো এক প্রকার রেশমি জাল তৈরি করে এবং জালের ভিতরে থেকে চালের ক্ষতি করে থাকে।

৩.১.৭ গুদামজাত শস্যের পোকামাকড় দমন

গুদামজাত শস্যের পোকা দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা-

- শস্য কাটার পরবর্তী সময়ে দানাশস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- রোদে শুকানোর সময় আশেপাশের গুদাম থেকে পোকা এসে যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দানাশস্যকে ভালোভাবে বাছাই করে গোলাজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গোলাজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- পাত্রে শস্য ভর্তি করার পর পাত্রের মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গোলাজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রতি কেজি শস্য দানার সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা-

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিডিভিপি (১০০%) ইত্যাদির ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩.১.৮ ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি

ধান থেকে উৎপাদিত চাল আমাদের দেশে দুইভাবে ব্যবহার করা হয়। যথা-

- **আতপ চাল (White rice):** ধান শুকিয়ে সরাসরি মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে আতপ চাল বলে।
- **সিদ্ধচাল (Parboiled rice):** ধানকে সিদ্ধ করার পর শুকিয়ে মিলিং করে যে চাল পাওয়া যায় তাকে সিদ্ধ চাল বলে।

ধান সিদ্ধকরণ পদ্ধতি

কৃষকের বাড়িতে হাঁড়ি পাতিল, ডেগচি বা কড়াইতে ধান সিদ্ধ করা হয়। প্রথমে ডুবন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখা (কমপক্ষে ৮ ঘন্টা) ধান সিদ্ধ করার পাত্রে ভর্তি করা হয় এবং পাত্রে সামান্য পানি দেওয়া। পাত্র চুলার উপর

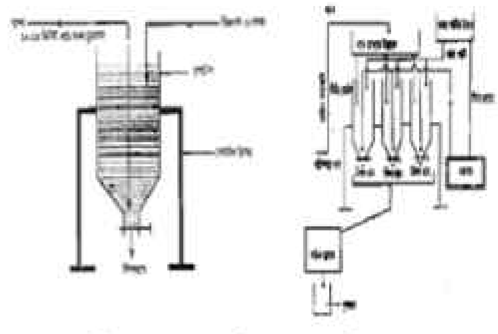
রেখে জ্বাল দিতে থাকলে যখন বেশির ভাগ ধান ফেটে যায় (প্রায় ২০ মিনিট প) তখন পাত্রের সিদ্ধ ধান উঠানে বা চাতালে পাতলা স্তর করে বিছিয়ে দিয়ে রোদে শুকানো (ধানে পানির পরিমাণ ১২-১৪% না হওয়া পর্যন্ত) হয়। ধান সিদ্ধ করার পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা- প্রচলিত পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতি।

প্রচলিত পদ্ধতি: আমাদের দেশে বেশির ভাগ সিদ্ধ ধানই প্রচলিত বা দেশীয় পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। এ পদ্ধতি আবার দুই প্রকারের। যথা-

- **একসিদ্ধ পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে ধান বিভিন্ন পাত্রে ১-২ দিন পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে শুকানো হয়।
- **দুইসিদ্ধ পদ্ধতি:** ধান পানিতে ডুবানোর পুর্বে আংশিক পানিপূর্ণ পাত্রে রেখে তাপ প্রয়োগ করা হয়। তাপের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ধানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয় এ অবস্থায় গরম ধানকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। প্রায় ১ দিন পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখার পর ভিজা ধানকে উপরে বর্ণিত একসিদ্ধ পদ্ধতিতে সিদ্ধ করা হয়। দুই সিদ্ধের চাল বেশ শক্ত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই ধান সিদ্ধ করার সময় যখন ধানের খোসা ফেটে দুই ভাগ হয়ে যায় তখন ধান সিদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি: ধান সিদ্ধকরণের আধুনিক পদ্ধতি প্রধানত তিন ধরনের।

ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ করার ধীর পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাকা চাতালের উপর চোঙাকৃতির এক বা একাধিক ট্যাংকে (tank) ধান সিদ্ধ করা হয়। ট্যাংকগুলো ইট ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মাণ করা হয়। ২৪-৭২ ঘন্টা ভিজানো ধান ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। এই ট্যাংক একটি নল দ্বারা বয়লারের সাথে সংযুক্ত থাকে। নলটি ট্যাংকের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢুকানো থাকে। বয়লার থেকে পানির বাষ্প সমস্ত ট্যাংকের ধানে ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নলে ভালভ (Valve) লাগানো থাকে। বয়লারের পানি চুলার আগুনে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের তাপে যখন সমস্ত ধান সিদ্ধ হয়ে খোসা ফেটে যায় তখন ট্যাংকের নিচের ভালভ খুলে সিদ্ধ ধান বের করে আনা হয়। অতঃপর তা শুকানো হয়।



চিত্র ৩.৪: ধান ভিজানো ও সিদ্ধকরণ

- **প্রেসার পদ্ধতি:** এটি ধান সিদ্ধকরণের একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এতে ধানকে ৭০°সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর উক্ত ধানে ১৮ মিনিট গরম বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে উচ্চ চাপে ধানের মধ্যে বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। এতে সিদ্ধ ধানের রং কিছুটা হলদে হয় এবং ভাঙ্গা চালের পরিমাণ কম হয়।

২০২৫

৩.১.৯ ধান মিলিং



চিত্র ৩.৫: ঢেঁকিতে ধান ভানা

ধান থেকে তুষ ও কুঁড়া সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াকেই মিলিং বা ধান ভাঙানো বলে। ধান মিলিং দুই ভাবে করা যায়। যথা- প্রচলিত মিলিং ও আধুনিক মিলিং

- **প্রচলিত মিলিং :** প্রচলিত মিলিং বা ধান ভাঙানোতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা হল- গাইল ও সিয়া (হামান দিস্তা) এবং ঢেঁকি।
- **আধুনিক মিলিং:** আধুনিক ধান মিলিং প্রক্রিয়ায় অল্প সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি ধান মিলিং করা যায়। এই পদ্ধতিতে চাউল পছন্দমত আকার করে পলিশিং করা যায়।



চিত্র ৩.৬: হামান দিস্তায় ধান ভানা

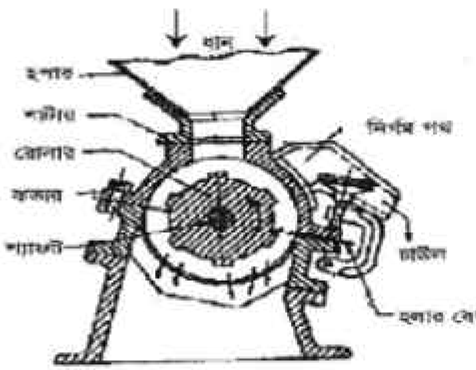
আধুনিক মিলিং এর প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ-

পরিষ্কারকরণ → তুষ ছাড়ানো → কুঁড়া ছাড়ানো → চাল সর্টিং → চাল পোলিশিং → চাল গ্রেডিং → প্যাকেজিং/সংরক্ষণ

৩.২ ধান থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ধান থেকে আমরা চাল, খৈ, চিড়া পেয়ে থাকি। আবার চাল থেকে মুড়ি, মুড়কি, মোয়া তৈরি করা হয়। তাছাড়া চালের গুঁড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। নিচে ধান থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের তালিকা দেওয়া হল-

- ভাত
- চিড়া
- খৈ, খৈ এর মোয়া ও মুড়কি
- মোয়া ও মুড়কি
- নাড়ু
- জাউ ভাত
- পোলাও ও বিরিয়ানি
- খিচুড়ি



চিত্র ৩.৭: ধান কলের বিভিন্ন অংশ

২০২৫

- মুড়ি, মিষ্টিমুড়ি ও ঝালমুড়ি
- ফ্রায়েড রাইস
- পায়েস ও ক্ষীর
- স্যুপ ও মাড় বা ফেন
- ভাতের পাপড়
- বেগুনি তৈরিতে চালের আটা
- চিপস তৈরি
- চাল ভেজে ছাতু
- ওরস্যালাইন তৈরিতে
- বেকারিতে বিভিন্ন খাদ্যে চালের গুঁড়া ব্যবহার
- চালের আটা বা গুঁড়া (রুটি ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরির জন্য) ইত্যাদি

৩.২.১ ধান থেকে মুড়ি, চিড়া ও খৈ তৈরি

মুড়ি (Puffed Rice) তৈরির পদ্ধতি: ধান থেকে মুড়ি তৈরির প্রবাহচিত্র নিচে দেওয়া হল-

ধান সংগ্রহ → পানিতে ভিজানো (জলীয় অংশ ৩০%) → পানি অপসারণ → ধান সিদ্ধকরণ → শুকানো (জলীয় অংশ ১২-১৪%) → মিলিং → প্যান এ তাপ প্রয়োগ (১১০°সে.) → লবণ যোগ (১০ মি.গ্রা./১০০ মি.লি. পানিতে প্রতি কেজি চালের জন্য) → গরম বালুতে ভাজা (২৫০°সে.) → মুড়ি (জলীয় অংশ ০.৫%) → প্যাকেজিং

ধান থেকে চিড়া তৈরির পদ্ধতি: ধান থেকে তৈরি চিড়া একটি সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার। সাধারণত চিড়া দ্বারা হালকা নাস্তা জাতীয় খাবার তৈরি করা হয়। যেমন চিড়ার মোয়া, চিড়া ভাজা, চিড়া পোলাও, চানাচুর ইত্যাদি। চিড়া ভিজিয়ে তাতে সবরি কলা ও গুড় চটকে খেলে পেট ভালো থাকে। ধান থেকে চিড়া তৈরির প্রবাহচিত্র নিচে দেওয়া হল-



চিত্র ৩.৮: মুড়ি

ধান সংগ্রহ → ধান ভিজানো (২৮°সে., জলীয় অংশ ৩০%, সময় ১২-১৮ ঘন্টা) → পানি অপসারণ → ধান ভাজা (২০০-২৫০°সে., ২০-৩০ সেকেন্ড)

ধান চেপ্টাকরণ (১৪৫ কেজি/বর্গ সে.মি.) → ধান ঠান্ডাকরণ (৪২°সে., জলীয় অংশ ১৯%) → চিড়া সংগ্রহ ও প্যাকেটজাতকরণ

ধান থেকে খৈ তৈরি: বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে নাস্তা হিসেবে খৈ বেশ জনপ্রিয়। রোদে শুকানো ধান থেকে খৈ তৈরি করা হয়। সিদ্ধ করা ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায় না। বালু উত্তপ্ত হলে বালুর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ধান হাঁড়িতে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়লে কিছুক্ষণের মধ্যে ধান খৈ এ পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন হাঁড়ির মুখে ঢাকনা দিয়ে ধরে নেড়ে সব ধান ফুটিয়ে খৈ এ পরিণত করা হয়। খৈ ফোটা শেষ হলে চালুনিতে সব ঢেলে তাড়াতাড়ি চালা হয়। বালু ফেলে এবং ধানের খোসা বা তুষ বাদ দিয়ে পরিষ্কার খৈ সংগ্রহ করতে হয়। বিন্নি ও কনকচূড় জাতের ধান থেকে খৈ তৈরি করা যায়। মুড়ির মতো খৈ থেকে মুড়কি, মোয়া তৈরি করা যায়। দই সহযোগে খৈ একটি মজাদার খাবার।



চিত্র ৩.৯: ধানের চিড়া



চিত্র ৩.১০: ধানের খৈ

৩.২.২ চাল থেকে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

চাল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। চাল থেকে তিন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত হয়। যথা-

- **শুকনো খাবার:** মুড়ি, খই, চিড়া ইত্যাদি
- **সিদ্ধ খাবার:** ভাত, পায়েস, ক্ষীর, ফিরনি, জর্দা ইত্যাদি
- **ভাজা খাবার:** চাল ভাজা, ফ্রায়েড রাইস ইত্যাদি

পায়েস রান্নার প্রয়োজনীয় উপাদান

- দুধ ২ লিটার
- সুগন্ধি চাল ২০০ গ্রাম
- কিশমিশ ২০ গ্রাম
- কাজুবাদাম ২০ গ্রাম
- চিনি ৬০০ গ্রাম
- এলাচ ৩ থেকে ৪ টি



চিত্র ৩.১১: পায়েস।

পায়েস প্রস্তুত প্রণালী

- একটা পাত্রে চাল নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- চুলায় পাত্রে দুধ নিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে দুধ কিছুটা ঘন করতে হবে।
- দুধ ঘন হয়ে আসলে তাতে চাল যোগ করে চাল সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে চিনি যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে।
- কাজু বাদাম ও কিশমিশ দিয়ে ৫ থেকে ৬ মিনিট রান্না করতে হবে।
- রান্না করার পর পায়েসে এলাচ যোগ করে একটু নেড়ে চুলা থেকে পাত্র নামাতে হবে।
- চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করার জন্য পায়েসের পাত্র কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।
- ঠান্ডা হয়ে গেলে পায়েস পরিবেশন করা যাবে।

শাহী জর্দা রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পোলাও এর চাল বা বাসমতি চাল- ২৫০ গ্রাম
- এলাচ ৬-৭ টি
- দারুচিনি ৪-৫ টি
- লবঙ্গ ২-৪ টি
- চিনি ২০০-২৫০ গ্রাম
- ঘি- ২-৩ চা চামচ
- আনারস ৪ ভাগের ১ ভাগ ছোট ছোট টুকরা করে রস সহ।
- তেল ৫০ মি.লি. অথবা পরিমাণমত।
- কিশমিশ ১ মুঠ
- জর্দা রঙ/ ফুড গ্রেড কালার ১-২ চা চামচ
- মোরব্বা কুচি পরিমানমত
- বাদাম কুচি পরিমানমত
- বেবি সুইটস ১২-১৫ টি



চিত্র ৩.১২: শাহী জর্দা

শাহী জর্দা প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে। পোলাও এর চাল হলে ১৫ মিনিট আর বাসমতি চাল হলে ২৫ মিনিট রাখতে হবে। এতে করে রান্নার পর চাল ভেঙ্গে যাবে না আর লম্বাটে হবে। এরপর পরিমান মত পানি, তেজপাতা, সামান্য লবণ, ১ চা চামচ তেল ও জর্দার রঙ মিশিয়ে পানি ফুটাতে হবে। পানি ফুটলে চাল দিয়ে ৫-৮ মিনিট সিদ্ধ করে নিতে হবে। পোলাও এর চাল হলে ৫-৬ মিনিট আর বাসমতি চাল হলে ৭-৮ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ চাল পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে। এবার একটি প্যানে ঘি গরম করে মিডিয়াম আঁচে আস্ত গরম মসলা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে আনারসের টুকরাগুলো, চিনি এবং পানি দিয়ে একসাথে নাড়তে হবে।পানি ফুটে বলক উঠলে সিদ্ধ চাল যোগ করে ভালোভাবে

মিশাতে হবে। এবার ঢেকে দিয়ে চুলা মিডিয়াম আঁচ থেকেও কমিয়ে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট রান্না করতে হবে। ১৫ মিনিট পর ১ চা চামচ ঘি দিয়ে হালকা নেড়ে দিতে হবে। এবার ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন সিদ্ধ ভাত বেশি ফুটে না যায়। এখন জর্দা নামিয়ে বাদাম কুচি এবং বেবি সুইটস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

৩.২.৩ আতপ চাল ও সিদ্ধ চাল থেকে খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

আতপ চাল থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য

- খিচুড়ি
- পায়েস
- ক্ষীর
- জর্দা
- পোলাও
- বিরিয়ানি ও তেহারি
- ফিরনি
- চালের গুঁড়া বা আটা
- চালের সেঁকা রুটি
- ফ্রায়েড রাইস
- চালের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন পিঠা

চিকেন বিরিয়ানি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মুরগির মাংসের ৮ টি বড় টুকরো
- বাসমতি চাল ১ কেজি
- গোলমরিচ ৫ টি
- টকদই ১ কাপ
- আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- লংকা গুঁড়া ১ চা চামচ
- পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
- টমেটো ২ টি (টুকরো করা)
- মেথি আধা চা চামচ
- লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
- তেল ১ কাপ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ



চিত্র ৩.১৩: চিকেন বিরিয়ানি

২০২৫

- বিরিয়ানি মসলা ১ চা চামচ
- কাঁচালংকা ৫ টি (কুচি)
- পুদিনা পাতা কুচি ১ টেবিল
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- দুধ আধা কাপ (জাফরান মিশানো)
- গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
- লবণ পরিমাণমত
- এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, হলুদ, ধনে, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ করে।

চিকেন বিরিয়ানী প্রস্তুত প্রণালি: চাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে আস্ত গরম মসলা ও লবণ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। মুরগির মাংস, টকদই, হলুদ, ধনে, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, আদা, রসুন বাটা একত্রে মেখে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করতে হবে। তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে টমেটো দিয়ে ভুনা করে নিতে হবে। এবার ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেলে লেবুর রস, মেথি, গোলমরিচ গুঁড়া, গরম মসলা গুঁড়া, বিরিয়ানী মসলা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিতে হবে। এবার একটি বড় পাত্রে প্রথমে রান্না করা মাংস, তার উপর সিদ্ধ চাল, কাঁচা মরিচ, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা কুচি দিয়ে পুনরায় এভাবে আরেকটি লেয়ার করে তার উপর দুধ, ঘি ও লবণ ছিটিয়ে দিয়ে ভালো করে ঢেকে ৩০ মিনিট হালকা তাপে রেখে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

সাদা পোলাও তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ



চিত্র ৩.১৪: সাদা পোলাও

- চাল ৫০০ গ্রাম
- কাঁচা মরিচ ৪-৫ টি
- পেঁয়াজ কুচি ২-৩টি
- তেজপাতা ২-৩টি
- দারুচিনি ৪-৫ টুকরা
- এলাচ ৪-৫টি
- আদা বাটা ১ চামচ
- জিরা বাটা ১ চামচ
- কিশমিশ, গরম পানি, লবণ, ঘি ও তেল পরিমাণমত।

সাদা পোলাও প্রস্তুত প্রণালি

- চাল ভালভাবে ধুয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- চুলায় পাতিল বসাতে হবে। পাতিল ভালোভাবে গরম হলে তাতে ঘি নিতে হবে।
- তেল ভালভাবে গরম হবার পর তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে হবে, কিছুক্ষণ পর চাল ঢেলে দিয়ে ১০ মিনিট নাড়তে হবে।

২০২৫

- অন্য পাতিলে পানি গরম করতে হবে।
- তারপর লবন, আদা বাটা,এলাচ, কিশমিশ, দারুচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। এরপর গরম পানি পরিমাণমত ঢেলে দিয়ে একটু নেড়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর অল্প আঁচে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে। ১০-১৫ মিনিট পর জিরা বাটা দিয়ে একটু নেড়ে দিতে হবে। চাল শক্ত থাকলে আরও ৫-৬ মিনিট হালকা তাপে চুলায় রেখে দিতে হবে।
- এরপর নামিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

মাংসের তেহারী তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

মাংস মেরিনেটের জন্য

- মাংস ১ কেজি (হাড় ছাড়া)
- সরিষার তেল আধা কাপ
- আদা বাটা ২ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- টক দই আধা কাপ
- তেহারি মশলা
- লবন পরিমানমত
- চিনি আধা টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ
- সরিষা তেল ১/৪ কাপ (রান্নার সময়)
- পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ (রান্নার সময়)



চিত্র ৩.১৫: মাংসের তেহারি

তেহারি মসলা

- শুকনা মরিচ ৪ টি
- দারুচিনি ২ টুকরা (মাঝারি আকৃতি)
- এলাচ ৪-৫ টি
- তেজপাতা
- ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
- জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- জয়ফল গুঁড়া ১/২ চা চামচ

- জয়িত্রী গুঁড়া $\frac{১}{২}$ চা চামচ
- সাদা/কালো গোলমরিচ $\frac{১}{২}$ চা চামচ

পোলাওর জন্য

- কেওড়া জল ১ চা চামচ
- কাঁচা মরিচ ৫-৬ টি
- সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ
- আস্ত জিরা $\frac{১}{৪}$ চা চামচ
- কালিজিরা বা পোলাও এর চাল ৪ কাপ (৬৫০ গ্রাম)

মাংসের তেহারি প্রস্তুত প্রণালি

- তেহারি মসলা সব একসাথে গুঁড়া করে নিতে হবে।
- মাংস ছোট টুকরা করে কেটে ভাল করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- মাংসের সাথে তেহারি মসলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, টক দই, লবন, চিনি, পেঁয়াজ বাটা এবং আধা কাপ সরিষার তেল মিশিয়ে নিতে হবে।
- মেরিনেট করা মাংস ৩ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে।
- পাত্রে $\frac{১}{৪}$ কাপ সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজ ধূসর বর্ণের করে ভেজে নিতে হবে।
- এবার মেরিনেট করা মাংস এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।
- প্রয়োজনে পরিমানমত পানি যোগ করতে হবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- রান্না মাংস তেল এবং ঝোল থেকে আলাদা করে তুলে একটি প্লেটে রাখতে হবে।
- আলাদা একটি পাত্রে ৪ টেবিল চামচ সরিষার তেল গরম করতে হবে। তেল গরম হলে এতে কিছু কাঁচা মরিচ ও আস্ত জিরা দিতে হবে।
- আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সুগন্ধি পোলাও চাল ঢেলে দিয়ে মাঝারি আঁচে ৩ মিনিট ভাজতে হবে।
- এবার আলাদা করে রাখা মাংসের তেল এবং মসলা চালের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট ভাজতে হবে।
- এখন ৪ কাপ চালের জন্য ৮ কাপ গরম পানি যোগ করে স্বাদমত লবন দিতে হবে।
- পাত্রের মুখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বলক উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- বলক উঠলে আলাদা করে তুলে রাখা মাংস তাতে যোগ করতে হবে। নিম্ন আঁচে ১০ মিনিট বা পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে।
- পানি শুকিয়ে গেলে ঢাকনা তুলে কেওড়া জল এবং কাঁচা মরিচ দিতে হবে। নিম্ন আঁচে আরও ১০ মিনিট চুলার উপর রেখে দিতে হবে।

২০১৫

- এর মাঝে ১ থেকে ২ বার রান্নার পাত্র উপর-নিচ করে হালকা ঝাঁকিয়ে দিতে হবে যাতে পোলাও এবং মাংস ভালোভাবে মিশে যায়।
- এখন মাংসের তেহারি পরিবেশনের জন্য তৈরি। শসা, কাঁচা পেঁয়াজ এবং লেবুর সাথে পরিবেশন করতে হবে।

সিদ্ধ চাল থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য নিম্নরূপ

- ভাত
- বসাভাত বা বৌভাত
- মাড় ফেলা ভাত
- ভাতের মণ্ড
- পান্তা ভাত
- খিচুড়ি
- মুড়ি
- নাড়ু ইত্যাদি।

সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ী তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ



চিত্র ৩.১৬: সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ী

- ভাতের চাউল ৭৫০ গ্রাম
- মসুর ডাল ৫০০ গ্রাম
- পেঁয়াজ কুঁচি ১/২ কাপ
- আদা বাটা ২ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ
- শুকনা মরিচ গুড়া ১ বা ১ ১/২ চা চামচ
- হলুদ গুড়া ২ চা চামচ
- তেজপাতা ২ টা
- লবন পরিমানমত
- কয়েকটা আস্ত কাঁচা মরিচ
- তেল ১ কাপ কম বেশি
- পানি পরিমানমত
- গরম মসলা (এলাচি কয়েকটা, দারুচিনি কয়েক পিস, লং কয়েকটা)

সিদ্ধ চালের ভুনা খিচুড়ি প্রস্তুত প্রণালি

চাল ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর একটি পাতিলে পানি দিয়ে চাল মধ্যম আঁচে ১০-১৫ মিনিট অর্ধসিদ্ধ করতে হবে। তারপর অর্ধসিদ্ধ চালের পানি ঝরিয়ে ফেলতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ দিতে হবে। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, আদা ও রসুন বাটা দিয়ে ভাজতে হবে। আগুন মাধ্যম আঁচে রাখতে হবে। অর্ধ চা চামচ লবণ দিয়ে নাড়তে হবে এবং অর্ধ কাপ পানি দিতে হবে। হলুদ ও মরিচের গুঁড়া দিতে হবে। এখন ভালো করে কষিয়ে নিয়ে ধুয়ে রাখা মসুর ডাল যোগ করতে হবে। একটু কষিয়েই এক বা দেড় কাপ পানি দিতে হবে। এবার মাধ্যম আঁচে রেখে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে ঢাকনা সরিয়ে দেখতে হবে এবং নাড়তে হবে। ডাল নরম হয়ে গেলে, পানি ঝরিয়ে রাখা ফুরফুরে অর্ধসিদ্ধ ভাত দিতে হবে। আরো দুই কাপ অর্থাৎ ভাতের চালের লেয়ারের এক ইঞ্চি উপর পর্যন্ত পানি দিয়ে হালকা তাপ দিতে হবে। আবার লবণ দেখে পরিমাণমত লবণ দিতে হবে। ২০-২৫ মিনিট খুবই হালকা তাপ দিতে হবে এবং ভালো করে নাড়তে হবে। যদি চাল শক্ত রয়ে যায় তাহলে সামান্য পানি ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পানি না লাগলেই ভালো। পরিশেষে পরিবেশন করা যাবে।

৩.২.৪ আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন খাদ্য

চালের গুঁড়া: উন্নত মানের আতপ চাল সংগ্রহ করে পরিষ্কার করে নিতে হয় তারপর উক্ত চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। চাল ভালোভাবে ভিজে গেলে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর উক্ত চাল শিলপাটায় বেটে চালের গুঁড়া তৈরি করা হয়। মেশিনেও চালের গুঁড়া তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে চাল ধুয়ে নিলেই হয়। চালের গুঁড়া রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। চালের আটা থেকে রুটি, ফিরনি, পিঠা ও বিভিন্ন ধরনের বড়া তৈরি করা যায়।

রুটি প্রস্তুত প্রণালি: চালের গুঁড়া বা আটা ও পরিমাণমত লবণ দিয়ে গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিতে হয়। অতঃপর উক্ত আটা ময়ান করে ভালোভাবে ডলে খামির বানাতে হয় যাতে উক্ত খামির রুটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়। খামির থেকে ছোট ছোট বল বা গুটি করে পিঁড়ি ও বেলনে বেলে পাতলা ও গোল করে (গমের আটার রুটির মতো) রুটি বানাতে হয়। গরম তাওয়াতে রুটি সেঁকে নিতে হয়। চালের গুঁড়ার রুটি খুব নরম হয় এবং ঠান্ডা হলে সহজে ভেঙে যায়। আজকাল রুটি তৈরির জন্য বৈদ্যুতিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এতে রুটি তৈরি ও সেঁকা একসাথে সম্পন্ন হয়।

ভাপা পিঠা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- আতপ চালের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম
- গুড় ১ কাপ
- নারকেল কুরানো বড় ১ কাপ
- লবণ $\frac{১}{২}$ চা চামচ
- পানি সামান্য
- পিঠার জন্য ছোট ২টা বাটি

- ২ টুকরা পাতলা কাপড়।


চিত্র ৩.১৭: ভাপা পিঠা

ভাপা পিঠা প্রস্তুত প্রণালি : চালের গুঁড়া অল্প একটু পানি দিয়ে ঝরঝরে করে মাখিয়ে নিয়ে বাঁশের চালুনিতে ছেলে নিতে হবে। এবার বাটিতে অল্প চালের গুঁড়া দিয়ে তার মাঝখানে গর্ত করে গুড় ও নারকেল দিয়ে ওপরে চালের গুঁড়া নিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবার পাতলা কাপড় ভিজিয়ে পিঠা ঢেকে দিয়ে বাটির নীচ পর্যন্ত কাপড় ধরে বাটি উল্টো করে ফুটন্ত পানির ওপর ছিদ্র করা ঢাকনার ওপর বসিয়ে বাটি উঠিয়ে পিঠা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায়রেখে দিতে হবে। ৫-৬ মিনিট পর পিঠা সিদ্ধ হলে উঠিয়ে পরিবেশন করা যাবে।


চিত্র ৩.১৮: সিদ্ধ পুলি পিঠা

সিদ্ধ পুলি পিঠা প্রস্তুত প্রণালি : আতপ চালের গুঁড়া ২ কাপ, খেজুরের গুড় পরিমাণমত, কোরানো নারকেল ১ কাপ। আতপ চালের গুঁড়া হালকা ভেজে পরিমাণমত পানি দিয়ে কাই করে নিতে হবে। কড়াইতে গুড় ও নারকেল একসঙ্গে নিয়ে চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিতে হবে। মিশ্রণটি শুকিয়ে আঠা আঠা হলে নামাতে হবে। খামির হাতে নিয়ে গোল গোল করে বেলে মাঝখানে পুর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারভাবে মুখটি বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে পুলি পিঠা বানিয়ে ভাপে সিদ্ধ করতে হবে।


চিত্র ৩.১৯: **পাকান** পিঠা

তেলেভাজা পিঠা বা পাকান পিঠা : চালের গুঁড়া আধা কেজি, খেজুরের গুড় ৫০০ গ্রাম, আটা ২৫০ গ্রাম, তেল ৫০০ মি.লি.। খেজুরের গুড় আর এক গ্লাস পানি জ্বাল দিয়ে নিতে হবে। তারপর এতে চালের গুঁড়া ও আটা দিয়ে ঘন করে মিশাতে হবে। কড়াইতে তেল নিয়ে চুলায় গরম করতে হবে। তেল গরম হলে ১ চামচ করে পিঠার গোলা তাতে ছেড়ে দিতে হবে। পিঠা ফুলে উঠলেই তৈরী হয়ে গেলো তেলেভাজা পিঠা বা পাকান পিঠা।


চিত্র ৩.২০: নকশি পিঠা

নকশি পিঠা : চালের গুঁড়া ২ কাপ, পানি দেড় কাপ, লবণ সামান্য, ঘি ১ টেবিল চামচ, সিরা গুড় আধা কাপ, চিনি ১ কাপ, পানি ১ কাপ একত্রে নিয়ে চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ফুটে উঠলে চালের গুঁড়া দিয়ে সিদ্ধ করে কাই বানাতে হবে। পুরু করে রুটি বানিয়ে পছন্দমত আকার দিয়ে কেটে নিয়ে খেজুর কাঁটা দিয়ে রুটিতে পছন্দমত নকশা করে ডুবোতেলে ভাজতে হবে। সিরায় ডুবিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়ে নিতে হবে।

তিলের পুলি প্রস্তুত প্রণালি: চালের গুঁড়া ২ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমত, নারকেল কোরা ২ কাপ, সাদা তিল আধাকাপ, গুড় দেড় কাপ, পানি ১$\frac{১}{২}$ কাপ। লবণ, পানি ও ঘি একসঙ্গে চুলায় দিতে হবে।

ফুটে উঠলে চালের গুঁড়া দিয়ে কাই বানাতে হবে। শুকনা তিল হালকা ভেজে নিতে হবে। গুড় ও নারকেল চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চটচটে হলে তিল মিশিয়ে নামাতে হবে। খামির ১৬ ভাগ বা ইচ্ছামত ভাগ করে প্রতি ভাগে বাটির মতো অর্ধচন্দ্রাকার বা ইচ্ছামত আকার দিয়ে মুখ বন্ধ করে পুলি করতে হবে। তারপর ভাপে সিদ্ধ করে পরিবেশন করতে হবে।



চিত্র ৩.২১: পাটিসাপটা পিঠা

পাটিসাপটা প্রস্তুত প্রণালি: এই পিঠা তৈরিতে হাতে করা আতপ চালের গুঁড়ি, বেকিং পাউডার, চিনি বা গুড়, দুধ, ক্ষীর, ছোট এলাচ, তেল বা ঘি, পরিমানমত নিতে হয়। দুই কাপ পানিতে চালের গুঁড়া বেকিং পাউডার, গুড় বা চিনি ও দুধ মিশিয়ে গোলা তৈরি করে ১-১.৫ ঘন্টা ঢেকে রেখে দিতে হয়। এবার ক্ষীর চটকিয়ে চিনি ও এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে নিতে হয়। হাঁড়িতে দুই চামচ ঘি গরম করে ঢেলে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামাতে হয়। পাত্র গরম করে কিছু তেল দিয়ে সারা পাত্র চামচ বা ন্যাকড়া দিয়ে মেখে নিতে হয়। অল্প আঁচে বড় চামচের ১ চামচ গোলা দিয়ে পাতলা করে রুটির মতো সম্পূর্ণ পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়। গোলার উপরিভাগ শুকিয়ে এলে রুটির এক পাশে পরিমাণমত ক্ষীরের পুর লম্বা করে দিয়ে ডিমের ওমলেটের মতো মুড়ে সামান্য ভেজে তুলতে হয়। এমনি করে প্রতি বার গোলা দেওয়ার পূর্বে পাত্রে ন্যাকড়া দ্বারা তেল মেখে নিয়ে আরও কয়েকটি পাটিসাপটা পিঠা বানায়ে ভেজে তুলতে হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করতে হয়। পিঠার মাঝে পুর হিসাবে মাখা সন্দেশ বা পাটালি গুড়ে জ্বাল দেওয়া নারিকেল কোরাও ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ৩.২২: দুধপুলি পিঠা

দুধ পুলি প্রস্তুত প্রণালি: এই পিঠা তৈরিতে আতপ চালের গুঁড়া, দুধ, চিনি, নারিকেল কোরা, ক্ষীর বা কনডেন্সড মিল্ক, তেল, এলাচ গুঁড়া পরিমাণমত নিতে হবে। প্রথমে একটি পানিশূন্য হাঁড়িতে নারিকেল কোরা, চিনি, দুধের ক্ষীর বা কনডেন্সড মিল্ক মিশায়ে জ্বাল দিয়ে পুলি পিঠার পুর তৈরি করে রাখতে হয়। এরপর একটি হাঁড়িতে আধা লিটার পানি ফুটাতে হবে। পানি ভালো করে ফুটে গেলে এতে চালের গুঁড়া, লবণ ও সামান্য তেল দিয়ে সিদ্ধ করে নামাতে হবে। একটু ঠান্ডা হলে আটা মাখার মতো করে রুটি তৈরির জন্য মন্ড বা খামির তৈরি করতে হবে। রুটির ভিতরে পুর অল্প অল্প করে ভরে পিঠার মুখ ভালোভাবে মুড়ে দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এর আকৃতি হবে অর্ধচন্দ্রাকার। পাত্রে তেল গরম করে হালকা আঁচে বাদামি রং করে পুলি ভেজে নিতে হবে। এবার একটি হাঁড়িতে দুধ, গুড় বা চিনি, এলাচ ও দারুচিনি একত্রে জ্বাল দিতে হবে। কিছুটা ঘন হয়ে এলে এতে পুলিগুলো একটি একটি করে ছাড়তে হবে। খুব সাবধানে খুন্তি দিয়ে নাড়তে হবে যাতে ভেঙে বা লেগে না যায়। দশ-পনেরো মিনিট চুলায় হালকা আঁচে রেখে নামাতে হবে। এ পিঠা গরম অথবা ঠান্ডা দুই ভাবেই খাওয়া যায় তবে ঠান্ডা পিঠাই বেশি মুখরোচক।

চিতই পিঠা প্রস্তুত প্রণালি: এ পিঠা তৈরিতে আতপ চালের গুঁড়া খেজুরের গুড় বা নারিকেল কোরা, পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা বা সাজ, বেগুনের বোটা বা ন্যাকড়া, সরিষার তেল ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনমত পানি দিয়ে চালের গুঁড়া গুলিয়ে ঘন করে গোলা তৈরি করে নিতে হবে। এখন পিঠা তৈরির বিশেষ ধরনের সরা ধুয়ে-মুছে চুলায় বসাতে হবে। এই সরায় ছোট ছোট অনেক গর্ত থাকে। পিঠা সেঁকার এই সরাকে তাওয়াও বলে। প্রত্যেকটি গর্তে একটি করে পিঠা সাঁকা যায়। এখন সরার সকল গর্তে বেগুনের বোটা বা ন্যাকড়া দিয়ে সরিষার তেল মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর চালের গোলা সরার সকল বাটিতে ভরে আঁচ কমিয়ে রেখে অন্য একটি সরা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক পর সরার ঢাকনা খুলে দেখা যাবে যে পিঠাগুলোর উপরের দিকের গোলা সিদ্ধ হয়ে ফুলে ওঠছে তখন খুন্তি দিয়ে আস্তে করে পিঠা তুলে নিতে হবে। যদি গোলা ঠিকমত শুকায়ে পিঠা তৈরি করা হয় তাহলে চামচ বা খুন্তি দিয়ে পাশে আলতো করে চাপ দিলে পিঠা উঠে আসবে। পিঠা তুলে পুনরায় ন্যাকড়ার কাপড়ে তেল লাগিয়ে উক্ত সাজরা বা সরার খাঁজ মুছে গোলা দিতে হবে। এইভাবে পর পর পিঠা বানাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সবগুলো পিঠা বানানো হওয়া পর্যন্ত চুলা থেকে সাজ নামানো না হয়। তৈরি পিঠা নারিকেল কোরা ও ঝোল গুড় সহযোগে পরিবেশন করা হয়। এ পিঠা জ্বাল দেওয়া ঘন খেজুরের রস ও দুধের মিশ্রণে সারারাত ভিজিয়ে শীতের সকালে পরিবেশন করলে খুবই সুস্বাদু লাগে। চিতই পিঠাকে অনেকে সাজের পিঠাও বলে।


চিত্র ৩.২৩: চিতই পিঠা

ভাজা পিঠা প্রস্তুত প্রণালি: চালের গুঁড়া, মুগডাল, লবণ, হলুদ গুঁড়া, আদা কুচি, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, নারিকেল কোরা, চিনি, সরিষার তেল, শুকনা মরিচ ইত্যাদি এই পিঠা তৈরিতে লাগে। প্রথমে ডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। কড়াই চুলায় চড়িয়ে নারিকেল কোরা ও চিনি একসঙ্গে মেখে কড়াইতে নিয়ে খুন্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে নারিকেলের পুর তৈরি করে আলাদা পাত্রে ঢেলে রাখতে হবে। কড়াই ধুয়ে আবার চুলায় চাপায়ে সামান্য তেল ঢালতে হবে। তেল গরম হলে তেজপাতা, শুকনো মরিচ,জিরা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড় করে ডাল ভেঙ্গে প্রেসার কুকারে দিতে হবে। ২ কাপ পানি, লবণ, হলুদ, আদা কুচি, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া কুকারে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে কুকারের মুখ বন্ধ করতে হবে। দুইবার বাঁশি দিলে চুলা থেকে নামায়ে ঠান্ডা করে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। এবার ডাল কড়াইতে নিয়ে জ্বাল দেওয়ার পর ফুটতে শুরু করলে তা চালের গুঁড়াতে ঢেলে দিতে হবে। সিদ্ধ ডাল ও চালের গুঁড়া ভালোভবে মেখে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। খামির থেকে ছোট ছোট বল নিয়ে রুটি করতে হবে। রুটির ভিতর অল্প অল্প করে নারিকেলের পুর ভরে গোলাকার পুলি তৈরি করে মুখ হাত দিয়ে টিপে বন্ধ করতে হবে। অবশ্যই পুলিগুলো ছোট ছোট আকারের করতে হবে। এবার কড়াইতে আরও তেল দিয়ে চুলায় চেপে পুলিগুলো বাদামি করে ভেজে নিতে হবে


চিত্র ৩.২৪: ভাজা পিঠা

৩.২.৫ পাপড় প্রস্তুত প্রণালি

পাপড় একটি সুস্বাদু নাস্তা। বিকালে চায়ের সাথে পাপড় পরিবেশন করা যায়। শিশু-কিশোরদের নিকট এটি অতি মজাদার খাবার। চাল থেকে দুই ধরনের পাপড় তৈরি করা যায়। যথা-
ভাতের পাপড় ও চালের পাপড়।

ভাতের পাপড় প্রস্তুত প্রণালি: আতপ চালে পানি দিয়ে মাড় না ফেলে ভাত সিদ্ধ করে রাখতে হবে। ঠান্ডা হলে পরিমাণমত জিরা, মরিচের গুঁড়া ও লবণ ভালোভাবে উক্ত ভাতের সাথে চটকে মেশাতে হবে। একটি কাঠের বাটার উপর বা থালার উপর পরিষ্কার ভিজা কাপড় পেতে মাখা ভাত ছোট ছোট গুটি আকারে সাজিয়ে নিতে হবে। পর পর চার দিন তা রোদে শুকাতে হবে। কাপড় থেকে গুটিগুলো তুলে নিয়ে স্টিলের বাসনে রেখে শুকিয়ে ছোট না হওয়া পর্যন্ত রোজ-রোদে শুকাতে হবে। কালো হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে বায়ুরোধী টিনের পাত্রে ভরে রাখতে হবে। পরিবেশনের সময় গরম তেলে ভেজে নিতে হবে।


চিত্র ৩.২৫: ভাতের পাপড়

চালের পাপড় প্রস্তুত প্রণালি: আতপ চাল এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন পানি সম্পূর্ণ ঝরিয়ে শিল-পাটায় পিষে নিতে হবে। চুলায় পানি ফুটলে আস্তে আস্তে পেষা চাল পরিমাণমত লবণসহ ফুটন্ত পানিতে মেশাতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ঘন ঘন নাড়তে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘন হয়ে না যায়। দুইবার ফুটলেই নামিয়ে নিয়ে একটি মোটা ও বড় পলিথিন শীটের উপর একটু দূরে দূরে এক হাতা (গোল চামচ) করে চালের গোলা পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে হয়। পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে সাবধানে তুলে নিয়ে বায়ুরোধক টিনে ভরে রাখতে হয়। খাঁটি ঘি বা তেলে ভেজে খেলে খুবই মজাদার লাগে। খাবার সময় চিনি দিয়েও পরিবেশন করা যায়।


চিত্র ৩.২৬: চালের পাপড়

৩.২.৬ সিদ্ধ চাল থেকে ভাত, খিচুড়ি ও ফ্রায়েড রাইস রান্নাকরণ

সিদ্ধ চালের ভাত: ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। প্রথমে পরিমাণমত চাল নিতে হবে। ডেকচিতে পরিমাণমত পানি নিয়ে গরম করতে হবে। চাল ভালো করে ধুয়ে পানির সাথে ছেড়ে দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ভাত যখন টগবগ করে ফুটে ওঠে তখন ঢাকনা খুলে হাতল বা খুন্তি দ্বারা সমভাবে নেড়ে দিতে হবে। এর ফলে সকল জায়গায় সমানভাবে তাপ লাগে এবং চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়। চাল সমভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা জানবার জন্য কয়েকটি ভাত টিপে দেখলে যদি খুব ছোট শক্ত দানা অনুভূত হয় তাহলে মনে করতে হবে যে ভাত প্রায় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর চুলা হতে নামিয়ে মাড় ফেলতে হবে। মাড় ফেলে ভাতের হাঁড়ি বা ডেকচি উপুড় করে রাখলে আস্তে আস্তে সব মাড় পড়ে যায় এবং ভাত খুব ঝরঝরা সুন্দর হয়। কিন্তু এভাবে ভাত রাঁধলে ভাতের মূল্যবান পুষ্টি উপাদান ভিটামিন বি এর অনেক অপচয় হয়।

বসাভাত বা বৌভাত: মাড় না ফেলে যে ভাত রান্না করা হয় তাকে বসাভাত বলে। এভাবে ভাত রান্নার জন্য যতটুকু চাল নেওয়া হয়েছে তার দেড় গুণ পানি নিতে হবে। যেমন এক কাপ চাল হলে দেড় কাপ পানি। নতুন চাল সিদ্ধ হতে কম পানি ও পুরানো চাল সিদ্ধ হতে বেশি পানি প্রয়োজন হবে। চাল ধুয়ে পানিতে নিতে হবে। তারপর জ্বাল দিলে কিছুক্ষণ পর সিদ্ধ হয়ে এলে দম বা হালকা আঁচে বসাতে হবে। দমে থাকাকালীন চামচ দিয়ে নেড়ে অর্থাৎ উপরের ভাত নিচে আর নিচের ভাত উপরে করে দিতে হবে অথবা ডেকচি ঝাঁকিয়ে ভাত ওলটপালট করতে হবে। কয়েকদিন এভাবে রাঁধলে পানি দেওয়ার আন্দাজ হয়ে যাবে। পরে আর মাপতে হবে না। মাড় না ফেললে ভাতের খাদ্যগুণ অনেক বেড়ে যায়। ভাত খুব সুস্বাদু হয়। অবশ্য খারাপ চালের ভাত দুর্গন্ধ লাগে।

পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত: পুরনো সিদ্ধ চাল বেছে ধুয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হবে। চাল সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হবে। চাল ও পানি একসাথে চুলায় দিলে কোন ক্ষতি হয় না। পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত খুব নরম করে নামাতে হয়। এই ভাত ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়।

নতুন সিদ্ধ চালের ভাত: ভাত রান্নার ১ ঘন্টা আগে চাল ধুয়ে রাখতে হবে। ফুটন্ত পানিতে চাল ঢেলে দিতে হবে। এই চাল সিদ্ধ হতে অল্প সময় লাগে। এই চালের ভাত একটু শক্ত থাকতে নামিয়ে মাড় বা ফেন ঝরিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে জাউ ভাতের মতো হয়ে যাবে। নতুন চালের ভাত খেলে অনেকের পেটে অসুখ হয়। সেক্ষেত্রে রান্নার সময় ভাতের মাড় ফেলে দিলে ভালো হয়।

ভাজা ভাত: ঘরে অনেক সময় ভাত থেকে যায়। এই ভাত ভেজে খাওয়া যায়, তবে ভাত যেন নরম না হয়। নরম হলে ভাত আর ঝরঝরে থাকে না। কড়াইয়ে অল্প তেল দিয়ে চুলায় বসিয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুঁচি ও শুকনা মরিচ দিতে হবে। এগুলো ভাজা ভাজা হলে পরিমাণমত বাসি ভাত কড়াইতে দিয়ে খুব সামান্য হলুদ, লবণ, গরম মসলা ও তেজপাতা দিয়ে নাড়তে হবে। ভাত ভাজা হলে নামিয়ে ফেলতে হবে। এই ভাত গরম গরম খেলেই ভালো লাগে।



চিত্র ৩.২৬: ভাজা ভাত

খিচুড়ি: চাল ও মুগডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। কড়াইয়ে ঘি, আদা, তেজপাতা নিয়ে চুলায় অল্প ভাজতে হবে। ডাল একটু ভেজে নিতে হবে। তারপর চাল, দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ভেজে পরিমাণমত পানি দিতে হবে। এরপর লবণ দিয়ে নেড়ে দিতে হবে এবং ফুটে উঠলে ঢেকে দিতে হবে। মৃদু জ্বালে ২০-২৫ মিনিট ফুটানোর পর হলুদ ও মরিচ দিলে ঝাল ভুনা খিচুড়ি তৈরি হবে। পরিবেশনের সময় পেঁয়াজ কুচি ভাজা ও ডিমের স্লাইস বা ডিম ভাজি দিলে উত্তম হয়। খিচুড়ির মধ্যে সবজির টুকরা, মটরশুঁটি, গাজর কুচি দিয়েও সবজি খিচুড়ি তৈরি করা যায়। অনেকে খিচুড়িতে পানির ভাব রেখে পাতলা খিচুড়ি তৈরি করেন। তবে ঝরঝরা খিচুড়িরই বেশি চাহিদা।

ফ্রায়েড রাইস: কড়াইয়ে পানি ফুটে উঠলে পোলাও চাল দিতে হবে। সাথে লবণ মিশিয়ে মাঝারি আঁচে ভাত সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ফুটাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ভাত যেন গলে না যায় এবং প্রত্যেকটি ভাত আলাদা থাকে। মাড় ফেলে ভাত শক্ত ঝরঝরে করে নিতে হবে। গাজর ও ওলকপি ছোট ছোট টুকরা করে ও মটরশুঁটি আলাদা ভাবে সিদ্ধ করতে হবে। পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ কলি কুচি করতে হবে। মাংস স্লাইস করতে হবে। একটি থালায় মাংস এবং সবজিগুলো নিয়ে তাতে ভাত রেখে, লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া ও স্বাদ লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর ডিম ভেঙ্গে স্বাদমত লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে ফোটাতে হবে। বড় হাঁড়ি বা কড়াইয়ে তেল গরম করতে হবে। তেলে মাংস দিয়ে ৫-৬ মিনিট এবং গাজর ও ওলকপি দিয়ে ৪-৫ মিনিট ভাজতে হবে। তারপর পেঁয়াজ ও ফেটানো ডিম দিয়ে নাড়তে হবে। ৭-৮ মিনিট ভাজার পর ডিম কিছুটা জমাট বাঁধলে ভাত দিয়ে নাড়তে হবে। তারপর সয়াসস(Soy sauce)দিতে হবে। পেঁয়াজ কলি দিয়ে ফ্রায়েড রাইস নামিয়ে নিতে হবে। শুধু চিংড়ি মাছ, ডিম, মুরগির মাংস দিয়েও ফ্রায়েড রাইস রান্না করা যায়।



চিত্র ৩.২৮: ফ্রায়েড রাইস

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: ধান মিলিং মেশিন সনাক্তকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ ধান মিলিং মেশিন সনাক্তকরণের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ বিভিন্ন ধরণের ধান মিলিং মেশিনসমূহ সনাক্ত করবে।

১.৪ ধান মিলিং মেশিনের বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করবে।

১.৫ প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল অনুযায়ী ধান মিলিং মেশিন পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবে।

১.৬ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

২০২৫

প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- দেশীয় যন্ত্রপাতি: গাইল ও শিয়া, ঢেঁকি
- আধুনিক যন্ত্রপাতি: আধুনিক মিলিং মেশিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ধান
- আতপ চাউল
- সিদ্ধ চাউল

কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- মিলিং-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলো স্থানীয় ধান কল বা চালের মিলে যেয়ে শনাক্ত করতে হবে।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।।
- যন্ত্রগুলো দেশীয় না আমদানি করা তা শনাক্ত করতে হবে।
- মেশিনের কাজের ক্ষমতা জানতে হবে।

এই জবটি পাঁচ বার করতে হবে ।

সতর্কতা

- শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মেশিন পর্যবেক্ষণ করবে, কাছে যাবে না।
- সবসময় শিক্ষক/গাইড/দক্ষ মেকানিক সাথে থাকতে হবে।
- মেশিনের ভিতর কোনো কিছু প্রবেশ করাবে না।
- চলন্ত মেশিনে হাত দেবে না।
- কাজের চাহিদা অনুযায়ী ম্যানুয়াল, টুলস ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে।

জব নং-০২

জবের নাম: গোলাজাত ধান, চাল, ডাল, আলুর ক্ষতিকারক পোকা দমন।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

২.১ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ পোকার নমুনা ও আক্রান্ত শস্যদানার নমুনা নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৩ পোকা দমনের উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৪ পোকা দমনের কীটনাশক চিহ্নিত করবে।
২.৫ গোলাজাত ধান, চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি শস্যের ক্ষতিকারক পোকা দমনের কৌশল শিখবে।
২.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান পরিষ্কার করবে।
২.৭ পোকা দমনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।
২.৮ আত্মপ্রতিফলন ব্যক্ত করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- স্পুন
- চালনী ও ডালা
- কাঠি, পাত্র
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পোকাসহ গোলাজাত ধান
- পোকাসহ গোলাজাত চাউল
- পোকাসহ গোলাজাত ডাল
- পোকাসহ গোলাজাত আলু
- কাগজ
- কলম/পেন্সিল
- রাবার

কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পোকার নমুনা ও আক্রান্ত দানাশস্য সংগ্রহ করতে হবে। (পোকার নমুনা কলেজ বা স্কুলের পেস্ট মিউজিয়াম থেকে বা গুদাম ঘরে পাওয়া যায়।)
- নমুনা সংগ্রহ ও পরিষ্কার করে তা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত করতে হবে।
- ক্ষতির প্রকৃতি (তাত্ত্বিক অংশ ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ এ বর্ণনা আছে) পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখতে হবে।
- পোকার দমন ব্যবস্থা (তাত্ত্বিক অংশ ৩.১.৬ ও ৩.১.৭ এ বর্ণনা আছে) অনুশীলন করতে হবে।
- প্রয়োজনে শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে নিকটস্থ চাল বা ধান গুদামজাত মিল বা সাইলোর কার্যক্রম দেখিয়ে আনতে পারেন।

এই জবটি পাঁচ বার করতে হবে।

সতর্কতা :

- পোকার নমুনা গুলো খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতি না হয়।
- পোকাগুলোর আকার-আকৃতি প্রায় একই রকম তাই পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক ভালো করে ব্যাখ্যা করবেন।

জব নং-০৩

জবের নাম: ধান থেকে চিড়া ও মুড়ি তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মুল্যায়ন মানদন্ড

৩.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

৩.২ ধান থেকে চিড়া ও মুড়ি তৈরির পুর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৩.৩ চিড়া ও মুড়ি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

৩.৪ চিড়া ও মুড়ি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

৩.৫ তৈরিকৃত চিড়া ও মুড়ি এয়ার টাইট পলিথিনে সংরক্ষণ করবে।

৩.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

৩.৭ চিড়া ও মুড়ি তৈরির অব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট :

- আধুনিক চিড়ার কল
- আধুনিক মুড়ির কল
- ওয়েট ব্যালেন্স
- সিলিং মেশিন
- থার্মোমিটার
- মিলিং মেশিন
- চালনী, ডালা
- বড় পাতিল
- সসপ্যান

২০১৭

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- ধান
- পানি
- লবণ
- পলিব্যাগ
- বালু

আধুনিক মেশিনে চিড়া তৈরির কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- তারপর ধান সংগ্রহ করতে হবে।
- তারপর ধান পানিতে ১২-১৮ ঘন্টা ভিজাতে হবে। ধানে পানির পরিমাণ হবে (৩০±১.৬৮)% এবং তাপমাত্রা (২৮±০.৯৫)°সে.
- এরপর পানি থেকে ধান তুলে নিতে হবে।
- এখন ২০০-২৫০°সে. তাপমাত্রায় ২০-৩০ সেকেন্ড ধান ভাজতে হবে। ধান ভাজা হয়ে গেলে ধানে পানির পরিমাণ হবে (১৯±১.৫)% ।
- তারপর ধানের তাপমাত্রা (৪২±১.৫)°সে. এ নামিয়ে আনতে হবে।
- তারপর চিড়ার মেশিনে ধানকে (১৪৫±৫) কেজি/সে.মি^{২} চাপে চ্যাপ্টা করতে হবে।
- চিড়া তৈরি হলে চিড়ায় ধানের খোসা থাকলে তা অপসারণ করতে হবে।
- পরিষ্কার চিড়া পলিব্যাগে এয়ার টাইট অবস্থায় সিলিং করে সংরক্ষণ করতে হবে।

আধুনিক মেশিনে মুড়ি তৈরির কার্যপদ্ধতি

মুড়ির চাল প্রস্তুতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপক্ব ও রোগমুক্ত ধান পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ধানকে দুই পর্যায়ে সিদ্ধ করতে হবে প্রথমে বড় পাত্র বা সসপ্যানে ধান নিয়ে কিছু বেশি পরিমাণ পানি দিয়ে ৭০°সে. তাপমাত্রায় ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।
- ধান ২০ মিনিট পর্যন্ত অল্প সিদ্ধ করে চুলা থেকে নামিয়ে গরম পানিসহ ১২ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ভিজানো ধানের পানি ঝরিয়ে আবারও অল্প পরিমাণ পানি যোগ করে ধান ফেটে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ ধান চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ৩-৪ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করতে হবে।
- পরদিন ধান এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে ধানের আর্দ্রতা ২০% এ নেমে আসে। পরীক্ষার জন্য ধানের চাল বের করে চিবুলে শক্ত ও মৃদু কটকট শব্দ হবে।
- এরপর শুকিয়ে ঠান্ডা করে ঢেঁকিতে বা কলে ভেনে মুড়ির চাল তৈরি করতে হবে।

মুড়ি তৈরির ধাপ

- প্রথমে প্রতিটি পাতিলে ৫০ কেজি বা এক বস্তা করে মুড়ি তৈরির চাল ঢালতে হবে।
- ১ টি মগে এক লিটার লবণ পানি তৈরি করতে হবে।
- ১৫ মিনিট লবণ পানি ঘুরন্ত হাতলের মাধ্যমে ১৫ টি পাতিলে নিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
- পরবর্তী ৪৫ মিনিট হাতলের সাহায্যে লবণ পানি ও চাল ভাল করে মিশাতে হবে। ১ ঘন্টা পর চাল মুড়ি হওয়ার উপযোগী হলে উঠিয়ে রোস্টারের ভিতর দিতে হবে।
- ১ মিনিটে রোস্টারের মধ্যে মুড়ি তৈরি হয়ে যাবে।
- বের হবার সময় মুড়ি ও বালু আলাদা আলাদা দুই জায়গায় পতিত হবে।
- এভাবে ১৫×৫০=৭৫০ কেজি মুড়ি অতি অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব। (১৫টি ডায়ালের প্রতিটিতে ৫০ কেজি করে মোট ৭৫০ কেজি)

এই জবটি সাত বার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- ধান সঠিক ভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে।
- মেশিন হতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে কাজ করতে হবে।
- মেশিনের প্রেসার ঠিক আছে কিনা খেয়াল করতে হবে।
- ধানে পানির পরিমাণ ও তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পলিব্যাগে চিড়া ও মুড়ি এয়ার টাইট অবস্থায় সিলিং করে রাখতে হবে।
- বালু গরম হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- মুড়িতে যেন বালু না থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

জব নং-০৪

জবের নাম: চিড়া ও মুড়ির মোয়া তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৪.১ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
৪.২ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৪.৩ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির উপকরণ সমূহ চিহ্নিত করবে।
৪.৪ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির কৌশল ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করবে।
৪.৫ তৈরিকৃত মুড়ি ও চিড়ার মোয়া ঠান্ডা করে এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
৪.৬ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৪.৭ মুড়ি ও চিড়ার মোয়া তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।



চিত্র ৩.২৯: মুড়ির মোয়া

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- পাতিল বা কড়াই
- নাড়ানি
- সসপ্যান
- সিলিং মেশিন
- চালনী
- চুলা



চিত্র ৩.৩০: চিড়ার মোয়া

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মুড়ি
- গুড় বা চিনি
- চিড়া
- জার বা পলিব্যাগ
- তেল
- পানি

মুড়ির মোয়া তৈরির পদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- সুন্দরভাবে ভাজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৫০০ গ্রাম মুড়ি নিতে হবে।
- ২৫০ গ্রাম গুড় বা চিনি ও পরিমাণমত পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- সিরা একটু ঘন হয়ে এলে তাতে মুড়ি ঢেলে দিতে হবে।
- পানি দিয়ে দ্রুত নাড়তে হবে।
- গরম অবস্থায় চুলা হতে একটি পাত্রে নামাতে হবে।
- হাতে তেল মাখিয়ে গরম থাকা অবস্থায় গোল করে মোয়া গড়ে নিতে হবে।
- বায়ুরোধী পাত্র বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

২০২৫

চিড়ার মোয়া তৈরির পদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- প্রথমে চিড়াকে কড়াই বা তাওয়ায় ভালোভাবে ৫-১০ মিনিট ভেজে নিতে হবে।
- তারপর পাতিলে গুড় ও পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- গুড়ের সিরা ঘন হয়ে এলে তাতে চিড়া ঢেলে হাত দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নামাতে হবে।
- অতঃপর মুড়ির মোয়ার মতো করে চিড়ার মোয়া তৈরি করতে হবে।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- গুড় বা চিনিতে পাকানো চিড়া ও মুড়ি ঠান্ডা হলে মোয়াবানানো যাবে না।
- অতিদ্রুত মুড়ি ও চিড়ার মোয়া বানাতে হবে।
- সতর্ক থাকতে হবে যেন শরীর আগুনের সংস্পর্শে না আসে।
- গুড় বা চিনির সিরা এমনভাবে করতে হবে যেন বেশি পাতলা বা ঘন না হয়ে যায়।

জব নং-০৫

জবের নাম: আতপ চালের গুঁড়া হতে ভাপা পিঠা তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

৫.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
৫.২ আতপ চালের গুঁড়া হতে ভাঁপা পিঠা তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৫.৩ ভাঁপা পিঠা তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৫.৪ কাজ শেষে কর্মস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৫.৫ ভাঁপা পিঠা তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো যথাস্থানে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- অ্যাপ্রন
- সেফটি মাস্ক
- সেফটি স্যু
- সেফটি হেলমেট/হেয়ার নেট
- সেফটি গগলস
- হ্যান্ড গ্লোভস (কাপড়/চামড়া)

প্রয়োজনীয় টুলস ও ইকুইপমেন্ট

- পাতিল
- নাড়ানি
- সসপ্যান
- সিলিং মেশিন
- চালনী ও ডালা
- চুলা
- গাইল ও শিয়া
- ঢেঁকি
- গ্রাইন্ডিং মেশিন
- শিলপাটা
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি
- মাটির ঢাকনা বা সরা
- কাঠি, পাত্র/ ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা
- বাটি
- আধুনিক মিলিং মেশিন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- আতপ চাল
- গুড় বা চিনি
- নারিকেল কোয়া
- পানি
- লবণ
- দুধ
- পাতলা সুতি কাপড়

ভাপা পিঠা তৈরির কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- ভাঁপা পিঠা তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আতপ চালের গুঁড়া তৈরির উপকরণ: আতপ চাল, শিলপাটা বা আধুনিক গ্রাইন্ডার, পানি।

আতপ চালের গুঁড়া তৈরির পদ্ধতি

- উন্নতমানের পরিষ্কার ১ কেজি আতপ চাল সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- শিলপাটায় অল্প অল্প করে বেটে আতপ চালের গুঁড়া তৈরি করা যাবে। মেশিনেও গুঁড়া করা যায়, সেক্ষেত্রে ভিজানোর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র চাল ধুয়ে তাৎক্ষনিকভাবে মেশিনে গুঁড়া তৈরি করা যাবে।
- আতপ চালের গুঁড়া ঠান্ডা করে প্যাকেট করে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভাপা পিঠা তৈরি

- চালের গুঁড়া সংগ্রহ করতে হবে। ভাপা পিঠা ও পাটিসাপটা পিঠার জন্য মেশিনের গুঁড়ার চেয়ে শিল-পাটায় বাটা গুঁড়া হলে ভালো হয়
- হাঁড়িতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি নিয়ে চুলায় চড়াতে হবে।
- চালের গুঁড়ার সাথে লবণ, দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে চালুনিতে ঢেলে নিতে হবে।
- হাঁড়ির মুখে ঢাকনা বা সরা (মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত) দিয়ে ঢেকে দিয়ে চতুর্দিকের মুখ আটা বা ময়দা গুলিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে হাঁড়ির বাষ্প চারদিক দিয়ে বের না হয়ে মাঝের ছিদ্রপথে বের হবে।
- ছোট বাটিতে অর্ধেক চালের গুঁড়া দিয়ে তার উপর কোরানো নারিকেল ও পাটালি গুড়ের কিছু টুকরো দিয়ে পুনরায় চালের গুঁড়া দিয়ে বাটি ভরতে হবে।
- পাতলা ভেজা কাপড় দিয়ে বাটি ঢেকে হাঁড়ির উপর মাটির ঢাকনার মাঝের ছিদ্রপথের উপর উল্টো করে বসাতে হবে।
- খুব সাবধানে উল্টানো বাটি সরিয়ে পিঠাটি পাতলা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে।
- তারপর একটি বড় সরা বা ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণটা ঢেকে দিতে হবে।
- ৫ মিনিট পর কাপড়সহ পিঠা তুলে আনতে হবে। পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে।
- এভাবে পিঠা তৈরি করে গরম অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- হাঁড়ির উপর পিঠা এমনভাবে বসাতে হবে যাতে ভেঙে না যায়।
- পিঠা সিদ্ধ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নামাতে হবে।
- সতর্ক থাকতে হবে যেন শরীর আগুনের সংস্পর্শে না আসে।
- খেয়াল রাখতে হবে যেন মাটির ঢাকনা দিয়ে পাতিলের গরম বাষ্প বের হয়ে না যায়।

অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য কোনটি?

২. ধান কোন ধরনের উদ্ভিদ?

৩. বাংলাদেশে উৎপাদিত ধানের প্রধান জাত কয়টি ও কি কি?

৪. চালের অ্যালিউরণ স্তর কোনটি?

৫. গোলাজাত ধানের ক্ষতিকারক তিনটি পোকার নাম লিখ?

২০২৫

৬. ধান সিদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?
৭. আতপ চাল কাকে বলে?
৮. আতপ চালের গুঁড়া থেকে তৈরি দুইটি খাবারের নাম লেখ।
৯. আতপ চাল থেকে তৈরি কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখ।
১০. সিদ্ধ চাল থেকে তৈরি কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কলে ছাঁটা ও ঢেঁকি ছাঁটা চালের পুষ্টিমান লেখ।
২. গুদামে ধান কী কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
৩. আতপ ও সিদ্ধ চাল বলতে কী বুঝায়?
৪. মুড়ি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৬. পায়েস রান্নার উপকরণগুলো উল্লেখ কর।
৭. সাইলো কেন ব্যবহার করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধানবীজের বিভিন্ন অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২. ধান বীজের পুষ্টিমান উল্লেখ কর।
৩. ধান সিদ্ধকরণের আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. আতপ ও সিদ্ধ চালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৫. পাটিসাপটা ও দুধপুলি পিঠা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬. পাপড় কী? চালের পাপড় ও ভাতের পাপড় তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. ফ্রায়েড রাইস তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৮. আতপ চালের পায়েস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৯. চিকেন বিরিয়ানি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ডালের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

Introduction to Pulses, Processing and Storage



বাংলাদেশের কৃষিতে ডালজাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জাতীয় ফসল এদেশের মানুষ, পশুসম্পদ এবং মাটির পুষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ডাল প্রধানত বিউলি, মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, মাষকলাই, খেসারি প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় মৌসুমি ফসলের শুকনো বীজ। সব রকমের ডাল মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী। ডাল প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এতে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ এবং অত্যধিক লাইসিন থাকায় ও দামে সস্তা হওয়ায় ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়। পুষ্টিবিদগণের মতে একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা ৪৫ গ্রাম।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ডালের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারব।
- ডাল থেকে বেসন, চানাচুর, বড়া/পেঁয়াজু ইত্যাদি তৈরি করতে পারব।

৪.১ ডালের পরিচিতি

ভারতবর্ষে ডাল এসেছে আর্যদের আগমনের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বাংলায় ডালের বিশেষ প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বাংলায় ডালের প্রচলন শুরু হয়। ডাল একটি রবি ফসল, মূলত সারাদেশে এর চাষ বিস্তৃত। তবে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও বরিশাল জেলায় বেশি ডাল চাষ হয়।

৪.১.১ ডালের সংজ্ঞা

ডাল লিগিউম জাতীয় রবি মৌসুমের ফসল। এটি লিগুমিনোসি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত খোসা ছাড়ানোর পর যুক্ত বা বিযুক্ত বীজপত্রগুলোকে ডাল বলে।

৪.১.২ ডালের জাত, মৌসুম, বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) (জয়দেবপুর, গাজীপুর)- এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্ত বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতের নাম, উৎপাদন মৌসুম ও বৈশিষ্ট্য নিম্নের ছকে দেওয়া হলো -

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	বৈশিষ্ট্য
১.	বারি ছোলা-৫	রবি	১.৮-১.৯	বীজের আকার ছোট ধূসর বাদামি বর্ণের।
২.	বারি ছোলা-৯	রবি	১.৫০-২.৫	রোগ প্রতিরোধী ও উচ্চ ফলনশীল।
৩.	বারি মসুর-৫	রবি	২.০-২.২	বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, বীজের রঙ লালচে বাদামী।
৪.	বারি খেসারী-১	রবি	১.৪-১.৬	পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী ।
৫.	বারি খেসারী-২	রবি	১.৫০-২.০	পাতা স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশ চওড়া।
৬.	বারি খেসারী-৩	রবি	১.৫-১.৭	অক্সালাইল ডাই-অ্যামিনো প্রোপায়ানিক এসিড (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪%
৭.	বারি মুগ-২	বিলম্ব রবি	১.২-১.৩০	সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ।
		খরিফ-১	১.৫-১.৬০	
		খরিফ-২	১.০-১.১০	

৪.১.৩ ডালের পুষ্টিমান

ডাল অত্যন্ত পুষ্টিকর দানাদার খাদ্যশস্য। এই শস্যে প্রচুর পরিমানে আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। অন্যান্য দানা জাতীয় শস্যের তুলনায় ডালে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। ডাল ও চাল মিশ্রিত খিচুড়ি শিশু ও বয়স্কদের বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। অঙ্কুরিত ডালের অঙ্কুরে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে।

ডালের পুষ্টি উপাদান

- **প্রোটিন:** ডালে ১৮-২৫% প্রোটিন থাকে। ডালের প্রোটিনের মধ্যে গ্লোবিউলিন ৩৫-৭২%, অ্যালবুমিন ১৫-২৫% ও প্রোলামিন ৪.৮%।
- **শর্করা:** ডালে শর্করা থাকে ৬০%-৬৫%, স্টার্চ থাকে ৪৭-৫৩% এবং চিনি থাকে ৭.৯%। ১০০ গ্রাম ডাল থেকে ৩৪৬ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

২০২৫

- **স্নেহ পদার্থ:** ডালে স্নেহ পদার্থ খুব কম থাকে, মাত্র ১-২%। তবে ছোলার ডালে ৫% স্নেহ পদার্থ থাকে।
- **ভিটামিন:** ডাল ভিটামিন বি$_1$ (থায়ামিন) এর ভালো উৎস। ছোলা, মুগ, মাষকলাইয়ের বীজ খোসাসহ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরিত হয়ে প্রোটিন বৃদ্ধি করে এবং অঙ্কুরিত ডালে পুষ্টিমান বাড়ে।
- **মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ :** প্রতি ১০০ গ্রাম ডালে ৮-১০ মি. গ্রাম লৌহ, ১০০-২০০ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৪২০- ৬২০ মি. গ্রাম ফসফরাস থাকে।

ডালে উপস্থিত পুষ্টিবিরোধী উপাদান: সাধারণত খেসারির ডালে বিটা-এন-অক্সালাইল অ্যামিনো-এল-অ্যালানিন (BOAA) নামক পুষ্টিবিরোধী উপাদান বা জৈব বিষ থাকে যা ল্যাথাইরিজম নামক পায়ের প্যারালাইসিস রোগ সৃষ্টি করে। একনাগাড়ে ২-৩ মাসের বেশি সময় শুধু খেসারির ডাল খাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া প্রতিদিন ২০০ গ্রাম বা তার বেশি পরিমাণ খেসারির ডাল দীর্ঘদিন খেলে ল্যাথাইরিজম রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ রোগে হাত ও পা অবশ হয়ে যায় যাকে প্যারালাইসিস বা অবশ রোগ বলা হয়। তবে খেসারির ডাল ৮-১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি নিংড়ে ফেলে দিলে ক্ষতিকর ল্যাথাইরাস উপাদান (BOAA) কমে যায়।



চিত্র ৪.১: ল্যাথাইরিজম আক্রান্ত কিশোর

৪.১.৪ ডালের ব্যবহার

আমাদের দেশে দৈনন্দিন বিভিন্ন খাদ্যে ডাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে ডালের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- প্রতিদিন রান্নায় ডাল ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- বিভিন্ন সবজি ডাল যোগে রান্না করা হয়ে থাকে।
- পিঁয়াজু বা ডালের বড়া তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- ডাল দিয়ে ডালপুরি তৈরি করা যায়।
- মুগ ডালের পরোটা বানিয়ে খাওয়া যায়।
- চানাচুর তৈরিতে ডালের ব্যবহার বেশ প্রচলিত।
- চটপটি ও ফুচকা তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- আমৃতি/আমিত্তি তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- হালুয়া বানাতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- পাকোড়া বানাতে ডাল ব্যবহার করা হয়।
- বেসন তৈরিতে ডাল ব্যবহার করা হয়।

৪.২ ডালের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

ডাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কাজকে এককথায় প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের জন্য ডাল গুদামজাত করে রাখা যায়।

৪.২.১ প্রক্রিয়াজাতকরণের সংজ্ঞা

খাদ্যশিল্পে খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত, পরিপাক ও শোষণযোগ্য, আয়ুস্কাল বৃদ্ধি, নতুন পণ্য তৈরি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যেসকল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে এক কথায় খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ বলে।

৪.২.২ সংরক্ষণ এর সংজ্ঞা

খাদ্যদ্রব্যকে অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং খাদ্যের নিজস্ব গুণাগুণ যথাসম্ভব বজায় রেখে দীর্ঘদিন ভালো রাখার পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বা খাদ্য সংরক্ষণ বলে। বর্তমানে খাদ্য সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যেমন-শুষ্কীকরণ (Drying/dehydration), হিমায়িতকরণ (Freezing), হিমাগারে সংরক্ষণ (Cold storage), পচন নিরোধক পদ্ধতি (Aseptic technique) ইত্যাদি।

৪.২.৩ ডালের সংরক্ষণ পদ্ধতি

সংরক্ষণের জন্য ডাল শুকানোর পদ্ধতি

- ডাল পরিষ্কার ও পাকা মেঝে অথবা প্লাস্টিকের শীটে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হবে।
- সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮-৯% এ আনতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ পর্যায়: ডাল ফসল কাটার পর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু হয়। তবে ডাল বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন-

মাঠ সংরক্ষণ: বীজ ফসল পাকার পর কাটার পূর্ব পর্যন্ত মাঠে থাকার সময়কে মাঠ সংরক্ষণ বুঝায়। বীজের মধ্যে যখন সবচেয়ে রসহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই বীজ পরিপক্ব হয়। ডালে পরিপক্ক অবস্থায় শতকরা ২৮-৩০ ভাগ রস বা পানি থাকে।

স্তূপাকারে সংরক্ষণ: ফসল বা বীজ কাটার পর বস্তা বন্দী বা পাত্রে রাখার উপযোগী অবস্থায় আনার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে স্তূপাকার সংরক্ষণ বোঝায়। ডাল বীজের বেলায় বীজ ড্রায়ারে বা রোদে শুকিয়ে শতকরা ৮-১০ ভাগ আর্দ্রতায় নামিয়ে আনতে হয়।



চিত্র ৪.২: ডাল বীজ সংরক্ষণ

বস্তা বন্দী বা পাত্র সংরক্ষণ: বীজ মাড়াই, ঝাড়াই, পরিষ্কারকরণ ও শুকানোর পর বিতরণ বা বিক্রি করার

পুর্ব পর্যন্ত সময়কে বস্তাবন্দী বা পাত্র সংরক্ষণ বোঝায়।

বিতরণকালীন সংরক্ষণ: বীজ বিতরণের জন্য বা বিক্রেতার নিকট পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বিতরণকালীন সংরক্ষণ বোঝায়।

সংরক্ষণ পদ্ধতি: ডাল বীজ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে বীজের আর্দ্রতা ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বীজের গুণাগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্নের সারণিতে বীজের বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তা দেখানো হলো-

সারণি ৪.১: বীজের আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে ডাল সংরক্ষণ

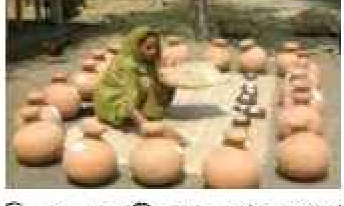
ক্রমিক নং	বীজের আদ্রতা	বীজের অবস্থা	সংরক্ষণ পর্যায়
১.	২৮-৩০%	বীজ পরিপক্ক হয়	ফসল কেটে সংরক্ষণ করতে হবে।
২.	১৮-২০%	বীজ নষ্ট হতে পারে।	ফসল কেটে তাড়াতাড়ি না শুকালে এবং স্তুপাকারে রাখলে বীজ নষ্ট হতে পারে।
৩.	১২-১৪%	ছত্রাক গজাতে পারে।	ফসল কেটে মাড়াই করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে কটকটে না করলে ছত্রাক গজায়।
৪.	১০-১২%	সাময়িক সংরক্ষণ করা যায়।	৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায় তবে পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
৫.	৮-১০%	সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্দ্রতা	এ অবস্থায় বায়ুরোধী পাত্রে দীর্ঘদিন রাখা যায় এবং পোকা আক্রমণ করতে পারে না।

সাধারণত তিন ভাবে ডাল সংরক্ষণ করা যায়-



চিত্র ৪.৩: পলিথিনযুক্ত বস্তায় ডাল সংরক্ষণ

পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তায় সংরক্ষণ: ডাল বীজ সংরক্ষণে পলিথিন যুক্ত ছালা বা প্লাস্টিকের বস্তা খুবই উপযোগী। পুরু পলিথিন ব্যাগ পাটের বস্তার ভিতরে ভরে এ ধরনের বস্তা তৈরি করা যায়। বস্তার মধ্যে ডাল বীজ ভরে প্রথমে পলিথিনের মুখটি পুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ছালার বস্তার মুখ রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এ ধরনের ছালার বস্তা ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে বস্তার ভিতরের পলিথিন ব্যাগ পরিবর্তন করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ৪.৪: মাটির পাত্র ডাল সংক্ষণ

পলিথিনযুক্ত মাটির পাত্রে সংরক্ষণ: উন্নত পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ প্রবেশ করিয়ে ডাল সংরক্ষণ করা যায়। ডাল ফসলের বীজ পলিথিন ব্যাগে ভরে পলিথিনের মুখ মোমের শিখায় পুড়িয়ে সিল করে দেয়া হয়। পরে পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া

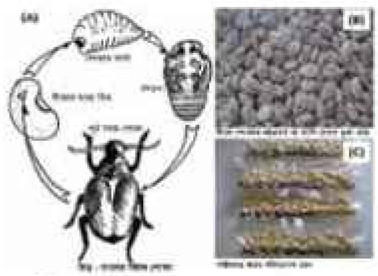
২০২৫

হয়। এ ধরনের পাত্রে ডাল বীজ ১ বছর পর্যন্ত ভালোভাবে রাখা যায়। এ ধরনের পাত্র ৩-৪ বছর ব্যবহার করা যায়। শুধু প্রয়োজনে ব্যাগটি পরিবর্তন করতে হয়।



চিত্র ৪.৫: টিনের পাত্রে ডাল সংরক্ষণ

টিনের উন্নত পাত্রে সংরক্ষণ: সাধারণত মাইল্ড স্টিল (Mild steel) শীট দ্বারা এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করার জন্য গোলাকার ঢাকনা চারিদিকে সিল করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে সিলিং দ্রব্য বা তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলে বাহিরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পাত্রে ডাল এক বছরের বেশি সময় ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ পাত্র ১০-১২ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ৪.৬: ডালে পোকার আক্রমণ

ডাল গুদামে যত বেশি দিন থাকবে ক্ষতির পরিমাণও তত বাড়তে থাকবে। এদের আক্রমণে শতকরা ১০০ ভাগ ডাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে। এ পোকা ডালের দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

গোলাজাত ডালের পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

- ডাল শস্য গুদামজাতকরণের পূর্বে দানা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়।
- ডালের দানা শুকিয়ে জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে ১২% এর নিচে আনতে হবে।
- বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা ১০% সেভিন গুঁড়া মিশিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।
- প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ফসটক্সিন ট্যাবলেট এর ২টি বড়ি ব্যবহার করতে হবে। এ বড়ি গুদামের আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হবে।
- এছাড়া ডাল বীজের সাথে সয়াবিন, বাদাম, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তেল মিশিয়ে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪.২.৫ গুদামজাত ডাল শস্যের পোকামাকড় দমন

গুদামজাত ডাল শস্যের পোকা দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- শস্য কাটার পরবর্তী সময়ে দানাশস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- রোদে শুকানোর সময় আশেপাশের গুদাম থেকে পোকা এসে যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভালোভাবে দানাশস্য শুকাতে হবে।
- দানাশস্যকে ভালোভাবে বাছাই করে গুদামজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গুদামজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- সংরক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মুখ খুব ছোট এবং পেট অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।
- শস্য ভর্তি করার পর মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গুদামজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হয়।
- প্রতি কেজি দানাশস্যের সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়ো মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিডিভিপি(১০০%) এর ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- প্রতি টন গুদামজাত বীজে ২-৪ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হলে কীটপতঙ্গ মারা যায়।

৪.২.৬ ডালের মিলিং

ডালের আবরণ অত্যন্ত শক্ত থাকে। ডালের খোসা অপসারণ করা না হলে খোসাসহ ডাল খেয়ে হজম করা কষ্টসাধ্য হয়। তাই ডালের খোসা অপসারণ (বডি হাস্কিং) করা দরকার। ডালের খোসা অপসারণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় ডালের খোসার সাথে খাদ্য উপযোগী উপাদান অনেকাংশ চলে যায়। তাই খোসা অপসারণ প্রযুক্তি এমন হওয়া উচিত যাতে খাদ্যোপযোগী আঁশের অপসারণ কম ঘটে। এটা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন-

২০২৫

- ডাল বীজের গুণগত প্রকৃতি।
- ডাল বীজের গঠন বা আকার।
- ডাল বীজের আয়তন।
- ডাল বীজের ভৌত গুণাবলি।
- ডাল বীজের পরিপক্বতা।
- ডাল বীজের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

ডাল প্রস্তুতকরণ বা মিলিং সাধারণত দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথা- খোসা আগলাকরণ ও খোসা অপসারণ।

খোসা আলগাকরণ: সব ডালের খোসা অপসারণের আগে আলগা করে নিতে হয়। তাছাড়া ডালের শাঁস ও খোসা সহজে পৃথক করা যায় না। ডালের খোসা সহজে আলগাকরণের জন্য ডাল শুকিয়ে নিতে হয়। ডাল ভালোভাবে শুকিয়ে না নিলে আলগাকরণের সময় ডালের শাঁস চ্যাপ্টা হয়ে গুঁড়া হয়ে যায়।

খোসা অপসারণ: ডালের খোসামুক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রামীণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র আকারে হস্তচালিত মেশিনে ও বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক মিলিং মেশিনে সম্পন্ন করা হয়।

গ্রামীণ পদ্ধতি: গ্রামীণ পদ্ধতিতে ডাল ভাঙানোর জন্য দুই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন- হামানদিস্তা ও জাঁতা।



চিত্র ৪.৭: আধুনিক ডাল মিলিং মেশিন

আধুনিক মিলিং মেশিন: এ মেশিন দ্বারা ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর জন্য খসখসে রোলার ব্যবহার করা হয়। রোলার ঘুরতে থাকলে ডাল দানা রোলারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। ডালের খোসায় ফাটল ধরানোর পর অ্যাব্রেসিভ রোলারের সাহায্যে খোসামুক্ত করা হয়। অনেক সময় ডালে ০.১-১ ভাগ পরিমাণ ভোজ্য তেলের প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে করে তেল খোসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শাঁসকে খোসা থেকে সহজে আলাদা করে ফেলে। তারপর এই ডাল ট্যাপারিং রোলারের সাহায্যে সহজেই খোসা অপসারণ করা হয়। তেল ব্যবহারে ডাল দানা তেল চুষে নেয় ফলে খোসা ও শাঁসের মধ্যকার শক্ত বাঁধন শিথিল হয়ে যায়।ডালের খোসা ও শাঁসের মধ্যকার বাঁধন শিথিল করার জন্য তেল বা পানি ব্যবহার করার পর ডালের টেম্পারিং করতে হয়। টেম্পারিং করার জন্য তেল বা পানি মিশানো ডাল শুকাতে হয়। আর্দ্রতা কমানোর জন্য ডাল দানা স্তূপাকারে রাখা হলে সমস্ত দানা তাপে গরম হয়ে যায়। এ তাপ দানার মধ্যে অনেক সময় ধরে থাকতে পারে। তবে আর্দ্রতা পরিমিতকরণ করতে অনেক সময় লাগে।তাই পানি বা তেল মেশানোর কাজ রাতের বেলায় করে পরিমিতকরণের কাজ করা হয়। এ ডাল দানা পরের দিন সকালে মিলিং এর উপযোগী হয় এবং সহজে ও অল্প সময়ে খোসামুক্ত করা যায়।

৪.৩ ডাল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ডাল থেকে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায় যেমন- খিচুড়ি, পিঁয়াজু, ঘুঘনি, চটপটি, ডালপুরি ইত্যাদি। আবার গ্রামাঞ্চলে ডাল বেটে শুকিয়ে ডালের বড়ি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন তরকারিতে ডাল মিশিয়ে খাওয়া হয়। ডাল থেকে নানা রকম মিষ্টিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। যেমন- মুগের জিলাপি, স্নসকলাই ডালের আমিত্তি। এছাড়া ডালের হালুয়া, ডালের বেসন ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

৪.৩.১ ডাল রান্না করার সাধারণ পদ্ধতি

ডাল রান্না করার পূর্বে কিছু নিয়মকানুন জেনে নেয়া উচিত। অড়হর ডাল, মটর ডাল এবং ছোলার ডালের একটি ধর্ম হচ্ছে এগুলো সিদ্ধ হতে চায় না, অনেক সময় লাগে। ডাল সিদ্ধ হওয়া নিচের বিষয়গুলোর নির্ভর করে-

- ডালের প্রকারভেদ
- পানির খরতা
- খাবার সোডার ব্যবহার
- চাল ধোয়া পানি
- নারিকেল তেলের ব্যবহার।

ডাল রান্না করার সাধারণ নিয়মাবলি

- প্রথমে ডালের আকার ছোট করে নিতে হবে। যদিও সব ডালের আকার ছোট করতে হয় না।
- ডাল রান্নার পূর্বে ভালো করে ধুয়ে ১-২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- তারপর ডালের সাথে প্রয়োজনীয় মসলা, লবন ও পানি যোগ করে চুলায় তাপ দিতে হবে।
- ডাল রান্নার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডাল ও পানি আলাদা আলাদা না থাকে। ডাল ও পানি যত মিশবে ততই খেতে সুস্বাদু হবে।
- ডাল সিদ্ধ হলে কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে অন্য আরেক পাতিলে রসুন, পেঁয়াজ, আস্ত জিরা মসলা দিয়ে বাঘার (টক জাতীয় ফল) দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

৪.৩.২ মসুর ডাল থেকে পিঁয়াজু ও বড়া প্রস্তুত প্রণালি

হালকা নাস্তার জন্য পিঁয়াজু ও ডালপুরির তুলনা নেই। বিশেষ করে বিকেলে চা এর সাথে পিঁয়াজু বা ডালপুরি সকলেই খুব পছন্দ করে। সেজন্য দেখা যায় শহরে বন্দরে গরম গরম পিঁয়াজু ও ডালপুরির চাহিদা অনেক বেশি। পিঁয়াজু তৈরিতে পিঁয়াজ বেশি ব্যবহার করলে খেতে সুস্বাদু হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মসুরের ডাল ২৫০ গ্রাম
- ডালের বেসন ২০ গ্রাম
- আদা বাটা ২০ গ্রাম
- শুকনা মরিচের গুঁড়া ৫ গ্রাম
- কাঁচা মরিচের কুচি ৫ টি
- লবণ পরিমাণমত
- পেঁয়াজ কুচি ১০০ গ্রাম
- সয়াবিন তেল পরিমাণমত



চিত্র ৪.৮: পিঁয়াজু

পিঁয়াজু প্রস্তুত প্রণালি

ডাল ধুয়ে ডুবো পানিতে ৪-৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর পানি ছেঁকে ডাল বাটতে হবে। ডালের মন্ডের সাথে শুকনা মরিচ, পিঁয়াজ, আদা, লবণ, কাঁচা মরিচ ও বেসন ভালোভাবে মেশাতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হলে চার আঙ্গুল দিয়ে ডালের মণ্ড তুলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে তেলে ছাড়তে হবে। এমনভাবে বেশ কয়েকটি পিঁয়াজু এক সাথে ভাজতে হবে। পিঁয়াজু মচমচে হলে তেল ছেঁকে তুলে টিস্যু বা কাগজের উপর রাখতে হবে। পিঁয়াজু সস বা সালাদ দিয়ে পরিবেশন করা যায়। বড়াতে পিঁয়াজের পরিমাণ কম হবে এবং এর আকৃতি গোল ও মোটা হবে। পিঁয়াজুতে পিঁয়াজের পরিমাণ বেশি হবে। আকৃতি চ্যাপ্টা হবে।

৪.৩.৩ অঙ্কুরিত মুগের সালাদ, পরোটা, পাকোড়া ও মুগাঙ্কুর প্রস্তুত প্রণালি

সব ধরনের ডালের মধ্যে মুগ ডাল অন্যতম। মুগ ডাল থেকে বহু ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম দেয়া হলো-

- মুগ ডালের পরোটা
- মুগ ডালের পাকোড়া
- **মুগাঙ্কুর**
- অঙ্কুরিত মুগের সালাদ ইত্যাদি

মুগ ডালের পরোটা প্রস্তুত প্রণালি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- সবুজ মুগ ডাল ১ কাপ
- টমেটো পেস্ট ২ টেবিল চামচ
- পিঁয়াজ ১ টা কুচি করা
- রসুন কুচি ১/২ চা চামচ
- হলুদ ১/৪ চা চামচ
- লবণ ১ চা চামচ
- চিনি ১/৪ চা চামচ



চিত্র ৪.৯ : মুগ ডালের পরোটা

- আটা/ময়দা ২ কাপ
- জোয়ান $\frac{১}{৪}$ চা চামচ
- লবণ $\frac{১}{২}$ চা চামচ
- পানি ১ কাপ
- সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ বাটা ১ চা চামচ
- ঘি $\frac{১}{২}$ কাপ

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে ডাল ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কুকার গরম হলে তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে পিঁয়াজ কুচি ভাজতে হবে। এবার রসুন কুচি ভেজে আদা বাটা দিতে হবে। তারপর কাঁচা মরিচ বাটা আর টমেটো পেস্ট যোগ করে নাড়তে হবে। এবার ভিজিয়ে রাখা সবুজ মুগ, হলুদ, লবণ, চিনি ও পরিমাণমত পানি দিতে হবে। কুকারে ঢাকনা লাগিয়ে প্রয়োজন মত সিদ্ধ করে নামিয়ে নিতে হবে। এবার আটা, পানি, লবণ, জোয়ান দিয়ে মেখে খামির বানিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। খামির থেকে ছোট ছোট বলের মত বানাতে হবে। একটি বল নিয়ে রুটির মত বেলে মাঝখানে আগেই বানিয়ে রাখা সবুজ মুগ ডালের পুর দিতে হবে। এবার চারদিকে মুড়ে আবার রুটির মতো বেলে নিতে হবে। সব বানানো হয়ে গেলে ঘি/তেল দিয়ে দুদিকে ভাজতে হবে। ভাজা হলে দই বা যে কোনও চাটনি বা সবজি এর সাথে পরিবেশন করতে হবে।

মুগ ডালের পাকোড়া প্রস্তুত প্রণালি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মুগ ডাল- ৫০০ গ্রাম
- আদা-রসুন বাটা - ১ টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ কুচি- পরিমাণমত
- ধনিয়া পাতা কুচি- $\frac{১}{২}$ কাপ
- চাট মসলা - ১ চা চামচ
- গরম মসলা গুঁড়া- ১ চা চামচ
- পরিমাণমত লবণ
- পরিমাণমত তেল



চিত্র ৪.১০ মুগ ডালের পাকোড়া

প্রস্তুত প্রণালি: আগে থেকে মুগ ডাল একটি পাত্রে ভালোভাবে ধুয়ে ৭-৮ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পানি থেকে মুগ ডাল তুলে ভালো করে বেটে নিতে হবে। এই পেস্টটা ঘন রাখতে হবে। এবার ডালের পেস্টে গরম মসলা গুঁড়া, চাট মসলা, আদা রসুন পেস্ট, কাঁচা মরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। চুলায় একটি প্যানে তেল গরম করে

২০২৫

নিতে হবে। এবার ডালের পেস্ট থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে গরম তেলে ছাড়তে হবে। বাদামী রং না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। ভাজা হলে উঠিয়ে নিয়ে গরম গরম সসের সাথে পরিবেশন করা যাবে।

মুগাঙ্কুর প্রস্তুত প্রণালি: আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় ডাল হিসেবে খাবার ছাড়া মুগের ব্যবহার অত্যন্ত কম। মুগ বীজ থেকে তৈরি মুগাঙ্কুর একটি উৎকৃষ্ট সবজি হিসেবে আমাদের দেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মুগাঙ্কুর বিভিন্ন উপাদেয় খাবার তৈরিসহ মাছ, মাংস ও অন্যান্য সবজির সাথে খাওয়া যায়। এতে শর্করা, আমিষ, খনিজ লবণসহ প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। পুষ্ট, পরিপক্ব বীজ ৩-৪ দিন পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে রাখলেই তা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুর বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৪ সেমি লম্বা হলে তা খাবার হিসেবে খাওয়া যায়। সাধারণত ১ কেজি বীজ থেকে ৮-৯ কেজি মুগাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তারপর পানি ঝেড়ে নিয়ে মুগাঙ্কুর বিভিন্ন খাবারের সাথে খাওয়া যায় এবং সালাদ হিসাবেও খাওয়া যায়।

অঙ্কুরিত মুগের সালাদ প্রস্তুত প্রণালি

প্রয়োজনীয় উপকরন



চিত্র ৪.১১: মুগাঙ্কুর

- অঙ্কুরিত মুগ ডাল ২ কাপ
- আলু ১ টি ছোট করে কেটে সিদ্ধ করা
- টমেটো কুচি ৩ টেবিল চামচ
- শসা কুচি ৩ টেবিল চামচ
- গাজর কুচি ৩ টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ কুচি ৩ টেবিল চামচ
- মুলা কুচি ১ টেবিল চামচ
- ধনিয়া পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ স্বাদমত
- চাট মসলা ১/২ চা চামচ
- গোল মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ
- লবণ পরিমাণমত
- লেবুর রস ১ চা চামচ

মুগাঙ্কুর এর সালাদ প্রস্তুত প্রণালি: সালাদ তৈরির জন্য আস্ত মুগ বীজ ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ৩-৪ দিন পর অঙ্কুর বের হলে প্রেসার কুকারে সামান্য পানি দিয়ে ৫ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা, টমেটো ও শসা কুচি, গাজর কুচি, মুলা কুচি মিশাতে হবে। অত:পর লেবুর রস, লবণ, চাট মসলা ও গোল মরিচ গুঁড়া মিশিয়ে মুগের সালাদ পরিবেশন করতে হবে।

৪.৩.৪ ছোলা ডালের হালুয়া প্রস্তুত প্রণালি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ছোলার ডালের পেস্ট ১ কাপ
- নারিকেল পেস্ট ২ কাপ

২০২৫

- চিনি $\frac{১}{২}$ কাপ
- এলাচ ২/৩ টি
- জাফরান সামান্য
- গুঁড়া দুধ ১ কাপ
- কাঠ বাদাম কুচি ২ চা চামচ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- পেস্তা বাদাম কুচি ২ চা চামচ
- কিশমিশ ৮/১০ টি



চিত্র ৪.১২: ছোলার ডালের হালুয়া

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে বুটের ডাল ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয় এবং পরে পানি ফেলে দিতে হয়। নতুন পানিতে ডাল এমনভাবে সিদ্ধ করতে হয় যেন ডালের পানি শুকিয়ে যায়। ডাল মিহি করে বেটে পেস্ট করে নিতে হয়। একটি সসপ্যানে ঘি নিয়ে জ্বাল দেওয়ার পর গরম হয়ে এলে ছোলার ডালের পেস্ট যোগ করে কিছুক্ষণ নাড়তে হয়। এবার,নারিকেল পেস্ট, জাফরান ও গুঁড়া দুধ এতে যোগ করে ভালো করে নাড়তে হয়। ঘন হয়ে এলে এর মধ্যে কাঠ বাদাম,পেস্তা বাদাম ও কিসমিস যোগ করে চুলার আঁচ অল্প করে আবারও নাড়তে হয় । হালুয়ার পানি শুকিয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে এর ওপরে আবার পেস্তা বাদাম, কাঠ বাদাম ও চেরি দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

৪.৩.৪ ডালের বড়া, বেগুনি ও আমৃতি প্রস্তুত প্রণালি

বেসন তৈরি: প্রথমে উত্তম মানের খেসারি অথবা মাষকলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করতে হয় এবং কুলা দিয়ে ঝেড়ে ধুলাবালি ও অপদ্রব্য পরিষ্কার করতে হয়। পাথরের জাঁতায় ডালের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। গম ভাঙ্গানোর মেশিনে এই ডাল ভাঙ্গায়ে বেসন পাওয়া যায়। ছোলার বেসনের মতো খেঁসারি বেসন দিয়েও বড়া, বেগুনি পিঁয়াজু ইত্যাদি উপাদেয় খাবার তৈরি করা যায়।



চিত্র ৪.১৩:ডালের বেসন

বড়া তৈরি: পরিমাণমত বেসন নিয়ে তাতে লবণ ও পানি দিয়ে গোলা তৈরি করে নিতে হবে। গোলার সাথে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হবে। কড়াইয়ে তেল গরম হলে ছোট ছোট বড়া তৈরি করে তেলে আস্তে আস্তে লাল করে ভাজতে হবে। গরম গরম সস দিয়ে খেলে ভাল লাগে।

বেগুনি তৈরি: খেসারির বেসন পরিমাণমত নিয়ে বড়া তৈরির মতো গোলা তৈরি করতে হবে। তারপর বাজার থেকে লম্বা বেগুন কিনে পাতলা



চিত্র ৪.১৪: বেগুনী

২০২৫

করে স্লাইস করা হয়। অতঃপর স্লাইসগুলো গোলায় ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিলেই বেগুনি তৈরি হয়ে যাবে।

মাষকলাই ও চালকুমড়ার বড়ি: পরিপক্ক বড় আকারের চালকুমড়া সংগ্রহ করে কাটতে হয়। কুমড়ার খোসা ও বিচি ফেলে মাংসল অংশ কুরানির সাহায্যে পেস্ট বা মণ্ড তৈরি করতে হয়। এই মন্ড একটি পাতলা কাপড়ে নিয়ে সারারাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এদিকে খোসা ছাড়ানো পুষ্ট মাষকলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভেজানো ডাল পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে শিলপাটায় পিষে কাই তৈরি করতে হয়। চালকুমড়ার পেস্ট ও ডালের কাই ভালো করে মিশ্রণ করে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে তা পাটি বা বড় পলিথিন শীটে সাজিয়ে রাখতে হয়। ২-৩ দিন বড়ি রোদে শুকাতে হয়। শীতকালে এ বড়ি তৈরি করে পলিব্যাগে বা টিনের কৌটায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হয়। মাষকলাইয়ের বড়ি মাছের তরকারি বা সবজির সাথে ব্যবহার করা যায়।


চিত্র ৪.১৫: মাষকলাই-কুমড়ার বড়ি

কচুরি: এটি একটি নাস্তা (Snacks) জাতীয় হালকা খাবার। কচুরি তৈরিতে ছোলার ডাল, ময়দা ও কিছু মসলা লাগবে। প্রথমে পরিমাণমত টাটকা ছোলার ডাল নিয়ে সামান্য চুন ও পানি দিয়ে মেখে নিয়ে রেখে দিতে হবে। ডাল ভালোভাবে সিদ্ধ করে পানি ঝরাতে হবে। কচুরির জন্য কালোজিরা, মৌরি, কড়াইয়ে ভেজে গরম থাকতেই থেঁতো করে নিতে হবে। এটাই কচুরির মসলা। পুরে খাবার সোডা মেশালে কচুরির ভিতর জালি জালি হবে। ময়দার খামির করে তা রুটির মত বেলে নিতে হবে। পুলি পিঠার মতো কেটে তাতে কচুরীর পুর দিয়ে চারধারে এটে নিতে হবে। কড়াইয়ে ঘি গরম করে কাঁচা কচুরিগুলো ভেজে নিতে হবে। কচুরিগুলো বাদামি রঙ হলে তা নামিয়ে ঘি মাখিয়ে সসসহ পরিবেশন করা যাবে। ছোলার ডাল ছাড়াও মুগ ডাল ও কলাইয়ের ডাল দিয়েও কচুরি তৈরি করা যায়।


চিত্র ৪.১৬: কচুরি

আমৃতি: মিষ্টান্নের জগতে আমৃতি খুবই পরিচিত একটি নাম। এটি খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে অনেকটা জিলাপির মতো তবে জিলাপির চেয়ে এটি বেশ শক্ত এবং গোলাকার।এটি চিনির রসে ভিজিয়ে শক্ত করা হয়।

আমৃতির জন্য চিনির সিরা তৈরি: প্রথমে তিন ভাগ চিনি ও এক ভাগ পানি নিতে হবে। কড়াইতে চিনিসহ পানি জাল দিতে হবে। চিনির গাদ বা ফেনা উঠলে তা চামচ দিয়ে তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। সমস্ত গাদ ফেলে দেয়ার পর সিরা লালচে হয়ে উঠলে কড়াই নামিয়ে সিরা ছেঁকে রাখতে হবে। অল্প আঁচে চুলায় চাপালে ঘন সিরায় পরিণত হবে।



চিত্র ৪.১৭: আমৃতি

আমৃতি তৈরি: প্রথমে আমৃতি তৈরির ১০ দিন আগে ১ কেজি মাষকলাইয়ের ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। ডাল ভিজাবার ২ দিন পর ২০ গ্রাম চুনের পানি মিশাতে হয়। ১০ দিন পর ঐ ডাল বেটে আধা কেজি আতপ চালের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে গোলা তৈরি করতে হবে। গোলা যেন পাতলা হয়। এরপর কড়াইতে ঘি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জিলাপি তৈরির মতো একটি ন্যাকড়া জোগাড় করে তাতে ছিদ্র করে গোলা ভরতে হবে। এরপর কড়াইয়ে গরম ঘিয়ের মধ্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমৃতির মতো পাক দিতে হবে। পাক যত সুন্দর হবে আমৃতি দেখতে তত সুন্দর হবে। কড়াইতে যে কটা আমৃতি আটবে ঠিক সে কটাই দিতে হবে। উল্টে পাল্টে দিয়ে লালচে রঙের হয়ে এলে ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তুলে আমৃতি চিনির সিরায় ডুবাতে হবে। ১০-২০ মিনিট পর তুলে পাত্রে সাজিয়ে রাখতে হবে। অনেকে মাষকলাই ডালের পরিবর্তে সুজি দিয়ে আমৃতি তৈরি করে থাকে।

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: মুগাঙ্কুর তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
১.২ মুগাঙ্কুর তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
১.৩ মুগাঙ্কুর তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
১.৪ উপযুক্ত মুগ ডাল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
১.৫ মুগাঙ্কুর তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
১.৬ অঙ্কুরিত মুগ খাওয়ার উপযোগী কিনা পরীক্ষা করবে।
১.৭ মুগাঙ্কুর তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
১.৯ কার্যক্ষেত্রের নিয়মানুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চালনী ও ডালা
- কাঠি ও পাত্র
- ড্রাম
- মাটির পাতিল
- ঝাঁঝরি
- পলি ব্যাগ
- নেট কাপড়
- কুলা ও যাঁতা
- সসপ্যান
- হাতাযুক্ত তারের জালি
- চায়ের কাপ
- নাইফ
- বিভিন্ন প্রকার স্পুন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- মুগ ডাল/বীজ
- ক্যালশিয়াম হাইপো ক্লোরাইড
- সয়াবিন
- পানি
- ঝুড়ি

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স

কার্যপদ্ধতি

- কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- মাঝারি ধরনের মসৃণ খোসাযুক্ত বীজ মুগাঙ্কুরের জন্য নিতে হবে।
- বীজগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

- পানি ঝরানো মুগ মাটির পাত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। বীজ বেশি ঘন করে দেওয়া যাবে না। তাই পাত্রের তলদেশে ২-৩ স্তর করে বীজ ছড়াতে হবে।
- পাত্রে বীজ রাখার পর ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪ ঘণ্টা এবং শীতকালে ৬-৭ ঘণ্টা পরপর হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে কাপড় ভিজিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কুর যেন শুকিয়ে না যায়।
- অঙ্কুরিত বীজকে ছত্রাকমুক্ত রাখার জন্য ১২ লিটার পানিতে ১ চা চামচ ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রতি রাত ভিজা কাপড়েরর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৭-৮ দিন পর অঙ্কুরিত মুগ বীজ ৮-৯ সে.মি. লম্বা খাবার উপযোগী।
- অঙ্কুরিত মুগবীজ তুলে বড় ড্রামে পানির মধ্যে খুব সাবধানে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- অঙ্কুরিত মুগবীজের মান বেশি সময় বজায় রাখার জন্য হালকা গরম পানিতে ৩-৪ মিনিট ব্লানচিং করে নিতে হবে।
- এভাবে প্রাপ্ত মুগাঙ্কুর সালাদও সবজি হিসেবে বিভিন্ন খাবারের সাথে খাওয়া যায়।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- অঙ্কুর যেন কোনোভাবেই শুকিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- মুগবীজ বেশি বড় বা বেশি ছোট যেন না হয়, মাঝারি আকৃতির হতে হবে।

জব নং-০২

জবের নাম: ডালের বেসন তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

২.১ কার্যক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
২.২ ডালের বেসন তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
২.৩ ডালের বেসন তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৪ ডালের বেসন তৈরির ডাল নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
২.৫ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা বা খেসারির ধুলা পরিষ্কার করবে।
২.৬ ডালের বেসন তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
২.৭ তৈরিকৃত বেসন পলিথিন বা এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
২.৮ ডালের বেসন তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
২.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
২.১০ ডালের বেসন তৈরির অব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে। ১০৫

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চালনী ও ডালা
- ড্রাম
- ঝাঁঝরি
- কুলা ও যাঁতা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ছোলা/খেসারী ডাল
- পলি ব্যাগ

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- ব্লেন্ডার মেশিন
- গ্রাইন্ডার মেশিন
- সিলিং মেশিন

কার্যপদ্ধতি

- স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপুষ্ট, অক্ষত ছোলা বা খেসারি ডাল বাছাই করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
- কুলা দিয়ে ঝেড়ে ছোলা বা খেসারির ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হবে।
- পাথরের যাঁতায় ছোলায় বা খেলারির খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার মেশিনে ছোলা বা খেসারির ডাল ভাঙ্গাতে হবে। মিলে ভাঙ্গানোর ফলে ছোলা হতে পাউডার বা ময়দা তৈরি হবে। একে বেসন বলে।
- এই বেসন পলিথিন বা চটের বস্তায় সিলিং মেশিনের সাহায্যে মুখ বন্ধ/সিলিং করে রেখে দিলে ১ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

- এই বেসন হতে বেগুনি, পিঁয়াজু বিভিন্ন ধরনের রুটি তৈরি করা যাবে।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ডাল উন্নত মানের না হলে ভালো বেসন হবে না।
- সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে বেসনে পোকা ধরবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার মেশিন সতর্কতার সাহায্যে পরিচালনা করতে হবে।

জব নং-০৩

জবের নাম: চানাচুর তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদণ্ড

৩.১ কার্যক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
৩.২ চানাচুর তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৩.৩ চানাচুর তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
৩.৪ চানাচুর তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
৩.৫ চানাচুর তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
৩.৬ তৈরিকৃত চানাচুর পলিথিন বা এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।
৩.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
৩.৮ চানাচুর তৈরির অব্যাবহৃত সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

ক্রমিক নং	টুলস	ক্রমিক নং	টুলস	ক্রমিক নং	টুলস
১.	ঝাঁঝরি	৭.	হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত	১৩.	বিভিন্ন প্রকার

			চামচ		ডাইস
২.	ওয়েট ব্যালেন্স	৮.	হাতাওয়ালা তারের জালি	১৪.	বোল
৩.	চায়ের কাপ	৯.	সিলিং মেশিন	১৫.	বাঁশের চালুনি
৪.	চুলা	১০.	চা চামচ	১৬.	সসপ্যান
৫.	ছোট বাটি	১১.	পানির জগ	১৭.	সিলিং মেশিন
৬.	কড়াই	১২.	পলিব্যাগ		

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ	ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ
১.	ছোলার ডালের বেসন	৫০০ গ্রাম	৭.	মরিচের গুঁড়া	৩০-৩৫ গ্রাম
২.	চীনাবাদাম	১০০ গ্রাম	৮.	সাইট্রিক এসিড	১০ গ্রাম
৩.	আধাভাঙ্গা মটর ডাল	৫০ গ্রাম	৯.	লবণ	পরিমাণমতো
৪.	চিড়া	৫০-১০০ গ্রাম	১০.	ডিম	৪-৫ টি
৫.	জিরার গুঁড়া	২০ গ্রাম	১১.	সয়াবিন তেল প্রায়	৫০০ মি.লি.
৬.	ধনিয়ার গুঁড়া	২০ গ্রাম	১২.	পানি	পরিমাণমতো

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- ব্লেন্ডার মেশিন
- গ্রাইন্ডার মেশিন
- সিলিং মেশিন

কার্যপদ্ধতি

- স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামুলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- ছোলার বেসনের সাথে অল্প পরিমাণে পানি মিশাতে হবে যেন খামিরটি অল্প শক্ত হয়।
- এর সাথে রং, ডিম, সাইট্রিক এসিড এবং লবণ মিশিয়ে ডাইসে নিতে হবে।
- চুলায় কড়াই দিয়ে সয়াবিন তেল জ্বাল দিতে হবে।
- তেল ফুটে উঠলে তেলের কড়াইয়ের উপর একজন সহকারীকে সাথে নিয়ে চিকন ঝুড়ি তৈরির ডাইস ধরতে হবে।
- অল্প পরিমাণ খামির নিয়ে ডাইসের উপর চাপ দিলে চিকন ঝুরি গুলো গরম তেলে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় হাতাওয়ালা ছিদ্রযুক্ত চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে হবে।
- ভাজা হয়ে এলে চামচ দিয়ে তুলে তেল ঝরার জন্য ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রাখতে হবে।

২০২৫

- একই পদ্ধতিতে মোটা ঝুরি, গাটিয়া, পাপড় ও বুন্দিয়া সতর্কতার সাথে সময় নিয়ে ভাজতে হবে।
- চিনা বাদামের খোসা ফেলে কিছু সময় পানিতে ভিজিয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।
- মটর ডাল প্রায় ৫-৭ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে তারপর পানি ঝরিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে।
- চিড়াগুলো পরিষ্কার করে তেলে ভেজে নিতে হয়।
- একটি টেবিলের উপর পলিথিন কাগজ বিছিয়ে তার উপর প্রস্তুতকৃত ঝুড়ি, বাদাম, ডাল, চিড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া নিতে হবে। সব মিক্সার মেশিনে নিয়ে বা হাত দ্বারা ভালোভাবে মিশাতে হবে।
- বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের পলিব্যাগে ভরে সিলিং মেশিনের সাহায্যে সিলিং করতে হবে। এভাবে চানাচুর তৈরি করতে হবে।

এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ঝুরি যেন গরম তেলে পুড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বুন্দিয়া তৈরির খামির তরল গোলার মতো করতে হবে।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- চুলার আগুন হতে সতর্কতার অবলম্বন করতে হবে।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ডাল কাকে বলে?
২. ডালকে কেন গরিবের মাংস বলা হয়?
৩. একজন মানুষের দৈনিক ডালের চাহিদা কত?
৪. অঙ্কুরিত ডালে কী ভিটামিন থাকে?
৫. ডালে কোন ধরনের পুষ্টিবিরোধী উপাদান থাকে?
৬. ল্যাথাইরিজম বলতে কী বুঝায়?
৭. ডাল সংরক্ষণের জন্য ডালের আর্দ্রতা শতকরা কত ভাগ হওয়া দরকার ?
৮. ডাল বীজের পোকা দমনের জন্য কী ওষুধ দেওয়া যায়?

৯. মুগাঙ্কুর মানে কি?

১০. মুগাঙ্কুরে কী কী পুষ্টি থাকে?

১১. কচুরি বলতে কী বুঝায়?

১২. আমৃতি কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ল্যাথাইরিজম রোগ থেকে মুক্তির উপায় কি?

২. ডাল বীজ সংরক্ষণের পর্যায়গুলো কি কি?

৩. ডাল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. ডাল মিলিং কী কী অবস্থার উপর নির্ভর করে।

৫. ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতিগুলো কি কি?

৬. মুগ ডালের পরোটা কিভাবে বানাতে হয়?

৭. মুগ ডালের পাকোড়া তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. কচুরি কী ধরনের খাবার?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ও পুষ্টিতে ডাল বীজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ডালের পুষ্টি উপাদান বর্ণনা কর।

৩. ডাল সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা দাও।

৪. গোলাজাত ডাল ফসলে পোকার আক্রমণ ও দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৫. ডাল মিলিং এর গ্রামীণ ও আধুনিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৬. ডাল রান্নার সাধারণ নিয়মাবলি ও ডাল সিদ্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. মুগ ও মটর ডাল থেকে পরোটা, পাকোড়া, মুগাঙ্কুর তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. ছোলার ডালের হালুয়া কিভাবে তৈরি করতে হবে?

২০২৫

পঞ্চম অধ্যায়

তৈলবীজের পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

Introduction to Oil Seeds, Processing and Storage



মুখরোচক স্বাদের যে কোনো খাবার রান্নাতেই তেলের প্রয়োজন। তেল স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। তেল খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু করে, খাদ্যগুণকে অটুট রাখে এবং খাবারের খসখসে ভাব দূর করে। তেলে যে ভিটামিন বা খাদ্যগুণ রয়েছে তা খাদ্যবস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে এর স্বাদ ও গুণাগুণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমাদের দেশের তেল ফসলগুলো হচ্ছে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, তিসি, গর্জন তিল, সূর্যমুখী, কুসুম ফুল, সয়াবিন, নারিকেল ইত্যাদি। তেল ফসলগুলো আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে- আমাদের দৈনিক খাদ্যের মাধ্যমে ৫-৬ চা চামচ তেল খাওয়া প্রয়োজন। আমরা উদ্ভিজ্জ তেল ফসল থেকে দুই ধরনের তেল পেয়ে থাকি। যেমন- উদ্বায়ী তেল ও অনুদ্বায়ী তেল।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- তেল বীজের পরিচিতি জানতে পারব।
- তেল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারব।
- তেল বীজ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারব।

উদ্বায়ী (Volatile) তেল: যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাষ্পায়িত হয়ে উড়ে যায় তাকে উদ্বায়ী তেল বলে। যেমন- লেমন ঘাসের তেল, দারুচিনির তেল, কমলা লেবুর খোসারতেল, গোলাপের পাপড়ির তেল ইত্যাদি। এ তেল সুগন্ধি এবং কনফেকশনারিতে ব্যবহার করা হয়।

অনুদ্বায়ী (Non volatile) তেল: যে সকল তেল খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাতাসে মিশে যায় না বা বাষ্পায়িত হয় না তাদেরকে অনুদ্বায়ী তেল বলে। যেমন- সরিষা তেল, তিলের তেল, সয়াবিন তেল, বাদাম তেল, সূর্যমুখী তেল, তিসির তেল, ভেরেন্ডার তেল ইত্যাদি। উদ্ভিদ উৎস থেকে প্রাপ্ত এ তেলকে ভোজ্যতেল (Edible Oil) বলা হয়।

৫.১ তৈলবীজের পরিচিতি

যেসব শস্য থেকে তেল পাওয়া যায় সেগুলোকে তৈলবীজ বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। যথা- ভোজ্য তৈলবীজ (সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি) এবং অভোজ্য তৈলবীজ (তিসি, রেড়ি ইত্যাদি)।

৫.১.১ বিভিন্ন তেল বীজের নাম ও জাত

তেল ফসলের বিভিন্ন জাত: বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য তেল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তেল ফসলের উফশী জাতসমূহ নিম্নের সারণিতে বর্ণনা করা হলো-

সারণি ৫.১: বিভিন্ন জাতের তেল বীজের বৈশিষ্ট্য ও ফলন

ক্রমিক নং	তেল ফসলের নাম	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য	ফসল/হেঃ (টন)
১.	সরিষা	টরি-৭	ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের। তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%।	৯৫০-১০০০ কেজি
		সোনালী সরিষা (এস এস-৭৫)	ফলে ৪ টি কক্ষ থাকে। বীজ হলদে সোনালী, গোলাকার। তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।	১.৮-২.০
		বারি সরিষা-৮ (ন্যাপাস-৮৫০৯)	ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট। ফুল হলদে, বীজের রঙ কালচে। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%।	২.১-২.৫
		রাই-৫	পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে। ফুলকুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। বীজ লালচে বাদামি। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।	১.০-১.১
২.	চিনাবাদাম	মাইজচর বাদাম (ধাকা-১)	পাতা হালকা সবুজ, প্রতি বাদামে ১-২ টি দানা, দানার আকার মাধ্যম, গোলাকার, রঙ হালকা বাদামি।	১.৮-২.০ টন রবিতে ১.৬-১.৮ খারিফে
		ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২)	বাদামে দানার সংখ্যা ৪ টি, আকার মধ্যম, চ্যাপ্টা ও হালকা বাদামি, খরা সহনশীল জাত।	২.৪-২.৬
		ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১)	বাদামের শিরা উপশিরা খুব স্পষ্ট, দানার আকার বড়। বীজের সুপ্তিকাল ১০-১৫ দিন।	২.৭-৩.১ রবিতে ২.০-২.৫ খারিফে
		বারি চিনা	তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।	২.৩-২.৫
৩.	সূর্যমুখী	কিরণী ডিএস-১	জাতটির কান্ডের ব্যাস ১.৫-২.০ সে.মি.। পরিপক্ক পুষ্পমঞ্জুরী বা শাখার ব্যাস ১২-১৫ সে.মি.। প্রতি মাথায় বীজের সংখ্যা	১.৬-১.৮

			৪০০-৬০০। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ। জাতটি মোটামুটি অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল।	
৪.	গর্জন তিল	শোভা	গাছের কাণ্ড সাধারণত সবুজ ও বেগুনী রংয়ের হয়। ফুল ছোট ও হলুদ রংয়ের। বীজ সূচাকৃতির এবং ১.২৫ সে.মি. পাতলা ও বেশ মসৃন।	১.০৫-১.১০
৫.	পামওয়েল	রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফলন শুরু হয়। একটানা ৬০-৭০ বছর ফল দিয়ে থাকে। বছরে ৮-১০টি কাঁদি আহরণ করা যায়।		একটি কাঁদি ওজন ৪০-৮০ কেজি পর্যন্ত হয়।

৫.১.২ তেল ফসলের পুষ্টিমান

তেলের পুষ্টিমান: তেল ফসল বা তৈলবীজ উদ্ভিজ্জ চর্বির একটি উৎকৃষ্ট উৎস। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের আধিক্যের উপরই উদ্ভিজ্জ তেলের গুণাগুণ নির্ভর করে। ১ গ্রাম তেল থেকে ৯ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। নিচে বিভিন্ন প্রকার তেলের পুষ্টিমানের বর্ণনা দেওয়া হলো:

সরিষার তেল: সরিষা সাধারণত ৪০-৪৪% তেল এবং ২৪-২৫% আমিষ থাকে। সরিষা থেকে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। সরিষার তেলের বর্ণ হলুদ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত। অনেক স্থানে সরিষার তেল Salad Oil এবং কাসুন্দি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। সরিষা চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

তিলের তেল: তিলে সাধারণত ৪২-৪৫ % তেল এবং ২ % আমিষ থাকে। তিলে ৩৫-৫০% সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে যা স্বাস্থের জন্য ভালো। খোসা ছাড়ানো তিলে প্রায় ১৮.২% আমিষ থাকে।

তিসির তেল: তিসির বীজে ৩৫-৩৮% তেল ও তিসির খৈল এ ৭-১০% তেল থাকে। তিসির তেল ভোজ্য নয়।

গর্জন তিলের তেল: গর্জন তিল একটি ভোজ্যতেল ফসল। এ বীজে শতকরা ৩৮-৪২ ভাগ তেল, ২০-২৫ ভাগ আমিষ, ৪.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এ তেলে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের মধ্যে লিনোলিক এসিডের পরিমাণ ৫০ % এবং ফলিক এসিডের পরিমাণ ৩০ %।

চিনাবাদামের তেল : চীনাবাদাম একটি পুষ্টিকর তেলজাতীয় খাদ্য। চীনাবাদামের তেলকে এরাকিস তেল বা পিনাট তেলও বলে যা দেখতে হালকা হলুদ বর্ণের। এর বীজে শতকরা ৪৮-৫০ ভাগ শর্করা, ২৫-৩০ ভাগ তেল, ৪০-৪৫ ভাগ আমিষ, ১৫-২০ ভাগ সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও ৫-৭ ভাগ খনিজ পদার্থ রয়েছে। এই তেলে প্রচুর পরিমণে পামিটিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড ও অ্যারাকিডোনিক এসিড থাকে। চীনাবাদামে যথেষ্ট ভিটামিন বি, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন ই এবং অল্প পরিমাণে ভিটামিন এ, সি ও ডি রয়েছে।

সূর্যমুখী তেল: সূর্যমুখী বীজে শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ তেল এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমিষ থাকে। এ তেলে ৪০-৪৫% লিনোলিক এসিড এবং ২৫-৩০% অলিক এসিড থাকে। সূর্যমুখীর বীজে ১৫-২০% আমিষ ও ১৫-৩০% শর্করা থাকে। সূর্যমুখী তেল চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের একটি ভালো দ্রাবক। এ তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে রোগীদের অত্যন্ত উপকার করে। এ তেল ভিটামিন ই সমৃদ্ধ।

সয়াবিন তেল: সয়াবিন বীজে ৩৯-৪১% আমিষ, ১৯-২১% তেল এবং ২৪-২৬% শ্বেতসার এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যারোটিন রয়েছে।

পাম অয়েল: পাম গাছের বীজের মাংসল অংশ থেকে ১ ভাগ ও বীজের শাস থেকে ১ ভাগ পাম কার্নেল তেল পাওয়া যায়। পাম তেল স্বাদহীন, গন্ধহীন ও হালকা হলুদ বর্ণের। পাম তেলে বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন ই বেশি থাকে। পাম তেলে ১১% লিনোলিক এসিড ও ৪০% অলিক এসিড আছে।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলের ৯৯% চর্বি যার প্রধান অংশই সম্পৃক্ত চর্বি। ১০০ গ্রাম নারকেল তেল হতে ৮৯০ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। সম্পৃক্ত চর্বির অর্ধেক হচ্ছে লরিক এসিড। এছাড়া নারিকেল তেলে ফাইটোস্টেরল পাওয়া যায়।

চালের কুঁড়ার তেল বা রাইস ব্রান অয়েল: চালের কুঁড়ায় ২০-২৫% তেল থাকে। এই তেলে শূন্য মাত্রায় কোলেস্টেরল এবং আমিষ পাওয়া যায়। এ তেল ভিটামিন ই সমৃদ্ধ। নিম্নের সারণিতে তেল বীজের পুষ্টিমানের তালিকা দেওয়া হলো-

সারণি ৫.২: বিভিন্ন তেলবীজের পুষ্টি তালিকা

ক্রমিক নং	তেল ফসল	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (kcal)	চর্বি (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	জলীয় পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)
১.	চীনাবাদাম	২৫.৩	২৬.১	৫৬৭	৪.০.১	২.৪	৩.০	৩.১
২.	সরিষা	২০.০	২৩.৮	৫৪১	৩৯.৭	৪.২	৮.৫	১.৮
৩.	তিল	১৮.৩	২৫.০	৫৬৩	৪৩.১	৫.২	৫.৩	২.৯
৪.	তিসি	২০.৩	২৮.৯	৫৩০	৩৭.১	২.৪	৬.৫	৪.৮
৫.	গর্জন তিল	২৩.৯	১৭.১	৫১৫	৩৯.১	৪.৯	৪.২	১০.৯
৬.	কুসুম ফুল	১৩.৫	১৭.৯	৩৫৬	২৫.৬	২.৬	৫.৫	৩৪.৯
৭.	সূর্যমুখী	১৯.৮	১৭.৯	৬২০	৫২.১	৩.৭	৫.৫	১.০
৮.	সয়াবিন	৪৩.২	২০.৯	৪৩২	১৯.৫	৪.৬	৮.১	৩.৭
৯.	নারিকেল (শুষ্ক)	৬.৮	১৮.৪	৬৬২	৬২.৩	১.৬	৪.৩	৬.৬

২০২৫

৫.১.৩ তেল ফসলের বীজ সংরক্ষণ

সরিষা বীজ: পরিষ্কার ও শুকনা বীজ প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ জন্য কেরোসিন টিন বা মুখ বন্ধ করার উপযোগী মাটির পাত্র ব্যবহার করা যায়। বীজ সংরক্ষণের জন্য ৮ % বা এর কম আর্দ্রতা হলে বীজের ক্ষতি হয় না। তাই ৮-১০ % আর্দ্রতা পর্যন্ত বীজ শুকানো উচিত।

তিল বীজ: বীজ শুকায়ে তাড়াতাড়ি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। বায়ুরোধী মাটির পাত্র, টিনের কৌটা বা পলিথিন ব্যাগেও তৈলবীজ সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণ পাত্র ভালোভাবে শুকানো না হলে পাত্রের গায়ের সংস্পর্শে থাকা ছত্রাক বীজগুলোতে আক্রমণ করে।

চীনাবাদাম বীজ: চীনাবাদামের বীজ বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। তাই ৮-১০% আর্দ্রতায় শুকানো বীজ খোসাসহ (Pod) প্লাস্টিক ব্যাগে ভর্তি করে মুখ বায়ুরোধী করতে হবে। বায়ু নিয়ন্ত্রিত গুদামে রাখা হলে বীজ দীর্ঘদিন অক্ষত থাকে। গুদামে ২-৮°সে.তাপমাত্রা ও ৬৫ % আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখা হলে চীনাবাদাম বীজ দুই বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। এছাড়া প্রতি ১০০ কেজি বীজে ৩০০-৪০০ গ্রাম শুকনা চুন ($CaCO_3$) ছিদ্রযুক্ত কোটায় ভরে বায়ুরোধী প্যাকেটের মধ্যে রাখা হলেও চীনাবাদাম ভাল থাকে।

সূর্যমুখী বীজ: বীজ শুকিয়ে ৮ % আর্দ্রতায় আসার পর ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে (কেরোসিন টিন, প্লাস্টিক লাইনার যুক্ত ব্যাগ বা মটকা ইত্যাদি) রাখতে হয়। বীজ পাত্রটি ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনে প্রতি মাসে একবারে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। সূর্যমুখী বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে তেলের হার কমে যায়।

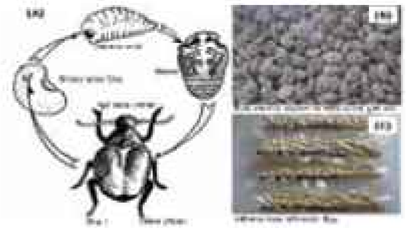
সয়াবিন বীজ: সয়াবিন বীজের সুপ্ততা খুব কম। তাই ভালোভাবে শুকায়ে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সয়াবিন বীজের বীজত্বক পাতলা, ফলে আঘাত পেলে বীজের ক্ষতি হয়।। উষ্ণ মন্ডলীয় দেশসমূহে সয়াবিন বীজ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ৩-৪ মাসের মধ্যেই সুপ্ততা নষ্ট হয়ে যায়। তবে বায়ুরোধী শুষ্ক পলিব্যাগে বা ড্রামে ৮% আর্দ্রতা সম্পন্ন বীজ প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় রাখা যায়।

তিসি বীজ: তিসি বীজের ত্বক পাতলা হওয়ায় বেশি শুকালে ভঙ্গুর হয়। সংরক্ষণের জন্য নাড়াচাড়ায় বীজের গায়ে ফাটল ধরতে পারে। তাতে বীজে রোগজীবাণু আক্রমণ করতে পারে এবং সহজেই বীজের সুপ্ততা নষ্ট হতে পারে। তাই সতর্কতার সাথে রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে ভালোভাবে গুদামে সংরক্ষণ করলে ১০ বছর পর্যন্ত বীজ ভালো থাকে।

গর্জন তিলের বীজ: গর্জন তিলের বীজ ২-৩ দিন ভালোভাবে শুকানোর পর ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পলিব্যাগে বা পলিথিন লাইনারযুক্ত চটের ব্যাগে বা টিনের কৌটায় বা মটকায় সংরক্ষণ করা যায়। বীজ পাত্রটি শুকনা, ঠান্ডা ও উঁচু স্থানে রাখতে হয়।

২০২৫

৫.১.৪ গোলাজাত তেল ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন


চিত্র ৫.১:তেল ফসলের ক্ষতিকারক পোকা

তৈলবীজের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে সুনির্দিষ্ট কোনো পোকামাকড় চিহ্নিত করা যায় না। তবে দানাশস্য হিসেবে চাল, গম ও বাদামে যেসকল পোকা আক্রমণ করে সেগুলোই সাধারণত তৈলবীজে আক্রমণ করে থাকে। যেমন- লাল শুসরী পোকা, খাপড়া বিটল পোকা ও সুরুই পোকা। পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গোলাজাত তেল বীজের ক্ষতি করে। এ পোকা বীজ দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেয়ে ফেলে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়।

গোলাজাত তেল ফসলের পোকামাকড় দমন

গোলাজাত তেল ফসলের পোকা দমনের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- তেল ফসল কাটার পরবর্তী সময়ে শস্যকে বেশি সময় ধরে মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।
- তেল ফসলকে ভালোভাবে বাছাই করে গুদামজাত করতে হবে।
- গুদাম ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গুদামজাত করার পাত্রগুলোকে উত্তমরূপে শুকিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- সংরক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মুখ খুব ছোট এবং পেট অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।
- শস্য ভর্তি করার পর মুখে কিছু বালি, তুষ বা কুঁড়া বা নিম পাতার গুঁড়া দিতে হবে। তারপর মুখ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে।
- শস্য গুদামজাত করার সময় বাঁশের নির্মিত গোলা বা ডোলের ভেতর ও বাহিরের অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভালোভাবে প্রলেপ দিতে হবে।
- প্রতি কেজি শস্যের সাথে ২.৯ গ্রাম হারে নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী পাতার গুঁড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

- বাহির থেকে গুদাম ঘরের ভেতরে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ করে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- গামা রশ্মি প্রয়োগ করে বিকিরণের মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা যায়।
- প্রতি ১০০০ ঘনফুট জায়গায় ফলিথিয়ন (৫০ ইসি) অথবা ডিডিভিপি (১০০%) ইত্যাদির ৮৫ গ্রাম কীটনাশক ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- গুদামজাত প্রতি টন বীজে ২-৪ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হলে কীটপ্রতঙ্গ মারা যায়।

৫.১.৫ তৈলবীজ মিলিং

তৈলবীজ মিলিং: তৈলবীজ মিলিং বা ভাঙ্গানোর পর আমরা তেল পেয়ে থাকি। তৈলবীজ মিলিং এর জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি প্রচলিত । যেমন-

- ঘানি পদ্ধতি
- এক্সপেলার পদ্ধতি
- সলভেন্ট এক্সট্রাকশন পদ্ধতি
- রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন পদ্ধতি

ঘানি পদ্ধতি: এটি তৈলবীজ ভাঙ্গানোর গ্রামীণ ও পুরাতন পদ্ধতি। ঘানি সাধারণত মানুষ বা পশু চালিত হয়ে থাকে। সরিষা ও তিল সাধারণত ঘানিতে ভালো হয়ে থাকে। ঘানিতে সর্বাধিক ৭০% পর্যন্ত তেল নিষ্কাশন করা যায়। সম্পূর্ণ কাঠের অবকাঠামোতে হামান দিস্তার ন্যায় ঘানি দ্বারা বীজ চূর্ণকরণ ও পেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়।



চিত্র ৫.২: ঘানিতে তেল নিষ্কাশন

এক্সপেলার পদ্ধতি: ঘানির উন্নত ও আধুনিক যান্ত্রিক সংস্করণই হচ্ছে এক্সপেলার পদ্ধতি। এটি বিদ্যুৎ বা ডিজেল জাতীয় জ্বালানি দ্বারা চালিত। বর্তমানে এই নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারাই বেশির ভাগ তৈলবীজ মিলিং করা হয়। এ যন্ত্র তেল নিষ্কাশনের হার প্রচলিত ঘানি অপেক্ষা বেশি। এ যন্ত্রে তেল নির্গমন পথে ফিল্টার দিয়ে তেল পরিষ্কার করা হয়। এক্সপেলারের তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রচলিত ঘানির অনুরুপ।



চিত্র ৫.৩: এক্সপেলার

সলভেন্ট এক্সট্রাশন পদ্ধতি: তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর যে অবশিষ্ট খৈল পড়ে থাকে তা থেকে সলভেন্ট এক্সট্রাকশন বা দ্রাবক আহরণ পদ্ধতিতে বাকি তেল নিষ্কাশন করা যায়। প্রাপ্ত খৈলকে গুঁড়া করে তাতে ফুড গ্রেড হেক্সেন দ্রাবক যোগ করা হয়। অতঃপর ৯৩-১০৪°সে তাপমাত্রায় ভালো করে মিশ্রিত করা হয়। পাতন পদ্ধতিতে তেল ও দ্রাবক আলাদা করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত তেলকে ক্রুড ওয়েল (Crude oil) বা অপরিশোধিত তেল বলে।

রিফাইনারি ও হাইড্রোজিনেশন পদ্ধতি: এ ধরনের প্লান্টে সাধারণত তেল বা চর্বি থেকে ফ্রি ফ্যাটি এসিড (Free fatty Acid) কমানো হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে ছাঁকন পদ্ধতি দ্বারা নিষ্কাশিত তেল থেকে অদ্রাব্য পদার্থ দূর করা হয়। ছাঁকার জন্য ফিল্টার প্রেস (Filter Press) ব্যবহার করা হয়। গাম জাতীয় পদার্থ দূরীকরণ বা ডিগামিং (Deguming) করার জন্য ৮২°সে. তাপমাত্রায় উপর থেকে পানি ঢেলে দেওয়া হয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা নাড়া হয়। তাতে বিজলা ও ঘোলা পদার্থ বা কলয়েডস (Colloids) ও ফসফোলিপিডস (Phospholipids) নিচে পতিত হয়। তেল নিরপেক্ষ করার জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণ বা চুনের পানি ব্যবহার করা হয়। এরপর হাইড্রোজিনেশন (Hydrogenation) করে তেলের রাসায়নিক পরিবর্তন করা হয়। এতে তেলের বর্ণ ও গন্ধ দূর হয়। এই প্রক্রিয়া তেলকে বিশোধন করে এবংপ্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির সাথে মিশ্রণ বা ইমালশন ঘটিয়ে কোমল করা হয় যাতে এই তেল রান্নার কাজে, রুটি, বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি শিল্পের উপযোগী হয়। তেলকে হাইড্রোজিনেশন করে মার্জারিন বা ডালডাও তৈরি করা যায়।



চিত্র ৫.৪: আধুনিক রিফাইনারি মেশিন

২০২৫

৫.২ তৈলবীজ থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

ভারতীয় উপমহাদেশে তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রধানত রান্নার কাজে তেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও তৈলবীজ থেকে বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি হয়। যেমন- কাসুন্দি, সয়াবড়ি ইত্যাদি।

৫.২.১ সরিষার পাউডার ও কাসুন্দি প্রস্তুত প্রণালি

সরিষার পাউডার: সরিষার বীজ ভালো করে বাছাই করে রোদে শুকাতে হয়। তারপর কড়াইতে ভালোভাবে ভেজে নিতে হয়। শিল-পাটা বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে সরিষার দানাগুলো ভেঙে নিতে হয়। এভাবে সরিষার যে গুঁড়া পাওয়া যায় তা রান্নার কাজে, আচার ও স্যান্ডউইচ বানাতে ব্যবহার করা যায়। মাছ মাংস ও শাকসবজি রান্নাতেও এই পাউডার ব্যবহার করা যায়।

সরিষার কাসুন্দি: কাসুন্দি তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে রাই সরিষা। এটি একটি চীন দেশীয় খাবার। কাসুন্দি তৈরিতে সরিষা, হলুদ, মরিচ, আদা, জিরা, লবণ ও প্রিজারভেটিভ প্রয়োজন হয়। প্রথমে সরিষা ধুয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তা শিলপাটায় বা গ্রাইন্ডিং মেশিন (Grinding machine) এ গুঁড়া করে নিতে হয়। কড়াইতে পানি ফুটিয়ে তাতে সরিষার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া, আদা বাটা ও লবণ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। চুলা থেকে নামানোর পূর্বে প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম সাইট্রিক এসিড (Citric acid) মিশাতে হয়। এরপর কাসুন্দি মাটির পাতিলে ভরে পাতিলের মুখ বন্ধ করে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। কাসুন্দি রাখার কাচের বৈয়াম গরম পানিতে জ্বাল দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। বোতলের উপরিভাগে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে রাখতে হয়। কাসুন্দি ভর্তি বোতল ৫-৭ দিন রোদে রেখে সংরক্ষণ করতে হয়।



চিত্র ৫.৬: কাসুন্দি

৫.২.২ চীনাবাদাম থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

বিশ্বের অনেক দেশে চীনাবাদাম খুবই জনপ্রিয় খাবার। একক বা অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে চীনাবাদাম মিশিয়ে আকর্ষণীয় খাবার তৈরি করা যায়। চীনাবাদাম থেকে সাধারণত যেসকল খাদ্য তৈরি করা যায় তা নিম্নে দেওয়া হলো-

- চীনাবাদাম বালিতে ভাজা
- চীনাবাদাম তেলে ভাজা
- চানাচুর
- চীনাবাদাম বিস্কুট
- চীনাবাদাম মুড়কি বা চিক্কি
- চীনাবাদাম ময়দা
- চীনাবাদাম দুধ
- চীনাবাদাম দুধের দই
- চীনাবাদাম মাখন
- চীনাবাদাম বার

২০২৫



চিত্র ৫.৭: চীনাবাদামের চিক্কি

চীনাবাদামের মুড়কি বা চিক্কি: চিনি বা গুড় পাতিলে গুলিয়ে দ্রবণ তৈরি করে ছেঁকে নিতে হবে। তারপর জ্বাল দিয়ে সিরাপ তৈরি করতে হবে। সিরাপ ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে কড়াইয়ে ঢালতে হবে। অন্য চুলায় চীনাবাদামের শাঁস তেলে ভালো করে ভেজে নিয়ে গরম কড়াইয়ে ঢেলে দিতে হবে। চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে মুড়কি তৈরি করতে হবে।



চিত্র ৫.৮: চীনাবাদামের বাটার

চীনাবাদামের বাটার: ১ কেজি চীনাবাদাম, ১০০ গ্রাম চিনি ও ৫০ গ্রাম সয়াবিন তেল নিতে হবে। শিলপাটা খুব ভালো করে ফুটানো পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ভাজা চীনাবাদামের খোসা ফেলে শাঁসগুলোর পাতলা লাল আবরণ ফেলে দিতে হবে। বাদাম পাটায় অল্প অল্প চিনি দিয়ে বাটতে হবে। বাটা বাদাম সয়াবিন তেল দিয়ে ফেটাতে হবে। উচ্চ মাত্রায় ঘূর্ণনের ফলে তেল মিশে গেলে বাদামের প্রোটিন ও মাখন আলাদা হয়ে যায়। জীবাণুমুক্ত বোতলে মাখন ভরে বায়ুরোধী করে রাখতে হবে। এ মাখন বেশিদিন রাখা যায় না।

৫.২.৩ তিল থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

তিল বীজের খাদ্যদ্রব্য : আমাদের দেশে তিল তেল অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রাম অঞ্চলে রান্নার কাজে তিল তেল ব্যবহার করা হয়। বিস্কুট কারখানায় পাউরুটি, রোল, কেক, কুকি ও ক্যান্ডিতে খোসা ছাড়ানো সাদা তিল বীজ ব্যবহার করা হয়। মাছ, মাংস, মুরগির মাংস, সবজি প্রভৃতি খাদ্য সুগন্ধময় করার জন্য তিল ব্যবহার করা হয়। অলিভ অয়েলের বিকল্প হিসেবে তিল তেল ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ৫.৯: তিলের নাড়ু

তিলের নাড়ু: তিল উত্তমরূপে ঝেড়ে ও বেছে নিয়ে কড়াইতে তেল দিয়ে তিলগুলো ভেজে নিতে হবে। চুলায় কড়াইতে পানি নিয়ে গুড় বা চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চিনির দ্রবণ ঘন হয়ে এলে অর্থাৎ সিরা হয়ে আসলে ভাজা তিলগুলো ছেড়ে দিয়ে উত্তমরূপে নেড়েচেড়ে নামাতে হবে। গরম থাকা অবস্থায় তিলের নাড়ু পাকিয়ে ঠান্ডা করে কোটায় সাজিয়ে রাখতে হবে। এ তিলের সাথে চালের গুঁড়া মিশিয়ে নাড়ু করতে হবে।


চিত্র ৫.১০: তিলের খাজা

তিলের খাজা: এটি তৈরি করতে ঘি, চিনি ও ময়দা প্রত্যেকটি ১ কেজি করে লাগবে। ১ কেজি ময়দায় ২৫০ গ্রাম ঘি পরিমাণমত পানি দিয়ে উত্তমরূপে ময়ান দিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। অতঃপর ২-৩ ইঞ্চি লেচি কেটে তা বেটে ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা করতে হবে। এই লেচিতে ঘি এর প্রলেপ দিয়ে দু'ভাজ করতে হবে এবং একটি ঠুঙ্গি মতো করতে হবে। উক্ত ঠুঙ্গি গোল পিঁড়ির উপর চতুর্দিকে সাজিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে ঠুঙ্গি গোল চ্যাপ্টা করতে হবে। এভাবে কয়েকবার কুন্ডলী পাকাতে হবে এবং চ্যাপ্টা করে ঘি মাখাতে হবে। শেষে লেচি বা রুটি বানিয়ে তা ঘিতে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তা অন্য পাত্রে ঘি ঝরানোর জন্য রাখতে হবে। এরপর ভাজা খাজাকে চিনির সিরায় ডুবিয়ে তারপর সাদা তিল খাজার সম্পূর্ণ শরীরে লাগিয়ে সাজিয়ে রেখে দিতে হবে।

তিলের চিক্কি: প্রথমে তিলকে ভালো করে ভেজে নিতে হয়। চুলায় কম আঁচে চিনি ও পানি গরম করা হয়। মিশ্রণটি নাড়তে নাড়তে যখন ঘন হয়ে আসে তখন পরিমানমত পানি যোগ করতে হয়। নরম থাকা অবস্থায় সামান্য লেবুর রস দিয়ে ঘি মাখানো ট্রে এর উপর ঢেলে পুরু করে রুটির মতো বেলে নিতে হয়। তারপর গরম থাকা অবস্থায় ছুরি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা যায়।

মার্জারিন (Margarine): একে উদ্ভিজ্জ তেলের মাখন বলে। আজকাল বিদেশে রান্নার কাজে মার্জারিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম তাপে স্থায়ী এমন উদ্ভিজ্জ তেলের ঘনত্ব বাড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে ৩% লবণ মিশ্রণের মাধ্যমে মার্জারিন তৈরি করা হয়। তিল, নারিকেল, পাম, সূর্যমুখী, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে মার্জারিন তৈরি করা হয়। হৃদরোগীদের বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তিদের প্রাণিজ্জ চর্বি ব্যবহার না করে মার্জারিন ব্যবহার করা স্বাস্থের জন্য ভালো।

৫.৩ খাদ্য শিল্পে সয়াবিনের ব্যবহার


চিত্র ৫.১১: সয়াবিনের গাছ

সয়াবিন বিশ্বের অন্যতম একটি প্রধান তেল ফসল। সয়াবিনের বীজ থেকে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্যতেল ও প্রোটিন পাওয়া যায়। এই তেলে শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড যেমন- অলিক এসিড ও লিনোলিক এসিড উচ্চমাত্রায় থাকে। সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ অন্যান্য ডালের তুলনায় দ্বিগুণ, গমের চেয়ে চার গুণ ও দুধের চেয়ে বারোগুন বেশি। সয়াবিন থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। যেমন- সয়াদুধ, সয়া, নাগেট ইত্যাদি।

৫.৩.১ সয়াবিনের খাদ্যদ্রব্য

যেকোনো ডালের সাথে সয়াবিন মিশিয়ে রান্না করলে তার পুষ্টিমান বেড়ে যায়। তবে সয়াবিনের পুষ্টিবিরোধী পদার্থ দূরীকরণের জন্য সয়াবিন অধিক সময় ধরে নিয়মানুযায়ী রান্না করতে হয়। সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যগুলো হলো-

- সয়া ময়দা
- সয়া ছাতু
- সয়া ময়দা ও আটা মিশ্রিত চাপাতি
- সয়া ডাল
- সয়াবিনের মিশ্রডাল
- সয়াবিনের সবজি বা তরকারি

সয়াবিনের নাস্তা ও মিষ্টান্নসমূহ

- সয়া ময়দার নাড়ু
- সয়া বাদাম বরফি
- জিলাপি
- সয়া বুন্দিয়া
- সয়াবিন বাদামের বিস্কুট
- সয়াবিনের সমুচা
- সয়াবিনের বড়া ও পেঁয়াজু

৫.৩.২ সয়াবিনের পুষ্টিমান

সয়াবিনের পুষ্টিমান: ভোজ্যতেল ও প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী সয়াবিন চাষ করা হয়। সয়াবিন তেলে সুস্বাস্থ্যের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সয়াবিন তেল রক্তে কোলেস্টেরল জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে। সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

সারণি ৫.৩: সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসলের পুষ্টিগুণ (প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ)

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	ফসল				
		সয়াবিন	ছোলা	মুগডাল	মসুর	অড়হর
১.	ক্যালরি	৪৩২	৩৭২	৩৪৮	৩৪৩	৩৩৫
২.	প্রোটিন (গ্রাম)	৪৩.২	২০.৮	২৪.৫	২৫.১	২২.০
৩.	তেল বা চর্বি (গ্রাম)	১৯.৫	৫.৬	১.২	০.৭	১.৭
৪.	খনিজ পদার্থ (মি.গ্রা.)	৪.৬	২.৭	৩.৫	২.১	৩.৫

সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ: সয়াবিন তেলে কিছু অপুষ্টিকর পদার্থ থাকে যেমন- ট্রিপসিন ইনহিবিটর, (Trypsin inhibitor) ও হিমাগ্লুটিনিন (Haemagglutinin)। এতে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না এবং পেট ফাঁপার মতো অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া সয়াবিনজাত খাদ্যে এক ধরনের ঘাস ঘাস গন্ধ থাকে যা বাংলাদেশে তথা উপমহাদেশসহ অনেক দেশের লোকজন পছন্দ করে না।

অপুষ্টিকর পদার্থ দূরীকরণের উপায়

- সয়াবিন রান্নার পুর্বে কমপক্ষে ২০ মিনিট গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে পরে পানি ফেলে দিতে হবে।
- ১০ মিনিট ধরে রোস্টিং (Roasting) করতে হবে।
- সয়াবিনের খোসা ছাড়িয়ে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ($NaHCO_3$) সহযোগে সারারাত (১২ ঘন্টা) পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি ফেলে দিতে হবে। তারপর গরম পানিতে ফুটালে এবং পরবর্তীতে ফুটানো পানি ফেলে দিলে সয়াবিনের অপুষ্টিকর পদার্থ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় কমে যায়।

৫.৩.৩ গ্রামীণ পর্যায় বা ঘরোয়া পদ্ধতিতে সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার

সমস্ত সয়া খাদ্যকে দুই ভাবে ভাগ যায়। যথা :

- **গ্রামীণ পর্যায়ের সয়া খাদ্য-** পেঁয়াজু, শিঙাড়া, সয়ানাট, সয়া ঘুঘনি, সয়া চটপটি ইত্যাদি।
- **শিল্প পর্যায়ের সয়া খাদ্য-** চানাচুর, সেমাই, বিস্কুট, শিশু খাদ্য, কেক ইত্যাদি।

গ্রামীন পর্যায়ের সয়া খাদ্য

সয়া বাটা তৈরি: মুখ খোলা পাত্রে দুই লিটার পানি নিয়ে তাতে ০.৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও সয়াবিন নিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ হলে ঠান্ডা পানিতে ডলে সয়াবিনের খোসা ছাড়াতে হয়। খোসা পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে শিল পাটায় বেটে কাই বা মণ্ড তৈরি করলে সয়া বাটা তৈরি হয় অথবা সয়াবিন শুকিয়ে মিলিং মেশিনে গুঁড়া করা যায়।

সয়া পিঁয়াজু: সদ্য প্রস্তুত সয়া বাটার সাথে পিঁয়াজু তৈরির সকল উপকরণ যেমন- গমের ময়দা বা চালের গুঁড়া শুকনা মরিচ বা মরিচ বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, আদা বাটা, ভালো করে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করতে হয়। কড়াইয়ে তেল নিয়ে চুলায় গরম করা হয়। তেল গরম হলে বেশি পাতলা না করে অর্থাৎ সামান্য মোটা করে বড় বা মাঝারি সাইজের মন্ড তেলে ছেড়ে দিতে হয় । অল্প আঁচে জ্বাল দেওয়ার পর পেঁয়াজু বাদামি রঙ ধারণ করলে তখন ছিদ্রযুক্ত চামচ দ্বারা নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

সয়া নাট: এটি তৈরি করতে সয়া ডাল, তেল, মরিচ গুঁড়া ও বিট লবণের গুঁড়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে সয়া ডালকে ১৫-২০ মিনিট ভালোভাবে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। তারপর তেল গরম করে সয়া ডালকে ১০-১৫ মিনিট ডুবো তেলে ভেজে তুলতে হয়। খবরের কাগজের উপর বিছিয়ে দিলে ডালের গায়ের অতিরিক্ত তেল শুষে যাবার পর মরিচ গুঁড়া,বিট লবণ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও গোলমরিচ বা এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে প্যাকেট বন্ধ করতে হয়। এই সয়া ডালকে সয়া নাট বলে।



চিত্র ৫.১২: সয়াবিনের ময়দা

সয়া ময়দা: ময়দা করার জন্য পরিমাণমত সয়াবিন সংগ্রহ করে তা হতে নষ্ট ও বিবর্ণ দানাগুলো বেছে বাদ দিতে হবে। পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ধুয়ে ৬-৮ ঘণ্টা ভিজাতে হবে। ভেজানো সয়াবিন একটি লোহার জালের উপর রেখে হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে খোসা ছড়িয়ে নিতে হবে। শুধু হাত দিয়েও খোসা ছাড়ানো যেতে পারে। পানিতে দিলে খোসা ভেসে উঠবে এবং তা ফেলে দিতে হবে। খোসা ছাড়ানো সয়াবিন ১৫ মিনিট ধরে গরম পানিতে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটানো সয়াবিন পানি ঝরিয়ে একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের উপর বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে শুকানোর পর তা আটা/ময়দার মিলে ভাঙিয়ে বা জাঁতায় পিষে সয়া ময়দা তৈরি করা হয়।

সয়া ভাত: সয়া ভাত রান্নার জন্য ১ ভাগ সয়া বাটা বা সয়া ময়দা ও ৯ ভাগ চালের প্রয়োজন হয়। চাল ভালো করে ধুয়ে হাঁড়িতে চাপাতে হয়। ভাত যখন অর্ধসিদ্ধ হয়ে আসবে তখন সয়া বাটা বা ময়দা দিয়ে ভালোভাবে ভাতের সাথে চামচ দিয়ে নেড়ে দিতে হয়। উত্তমরূপে ভাত সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতে হয়। ভাতের সাথে পানির পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে মাড় না ফেলেই ভাত ঝরঝরে অবস্থায় নামানো যায়। এই ভাতে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে।

সয়া খিচুড়ি: পুষ্ট ও পরিপক্ক সয়াবিন ভালোভাবে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে আধাভাঙা করে নিতে হয়। একটি পাত্রে ঘি বা ডালডা নিয়ে গরম করতে হয়। পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিতে হয়। তারপর হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা, আদা বাটা, তেজপাতা, এলাচি, মসলা দিয়ে ডালের সাথে ভালো করে নাড়তে হয়। এরপর পরিমাণমত পানি ও চাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। খিচুড়ি সিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ধনে পাতা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

সয়া চটপটি: চটপটির উপকরণ হিসেবে সয়াবিন ২৫০ গ্রাম, হলুদ পরিমাণমত, আলু মাঝারি সাইজের ২টি, ডিম ৪টি, শুকনা মরিচের গুঁড়া ভাজা ১৫ গ্রাম, জিরার গুঁড়া ১০ গ্রাম, ভিনেগার ১০ মিলি, পেঁয়াজ কুচি ৬ টি, মাঝারি সাইজের কাঁচা মরিচ কুচি ১০ টি, লবণ প্রয়োজনমত তেঁতুল বা লেবুর রস প্রয়োজনমত, পানি পরিমাণমত নিতে হয়। প্রথমে সয়াবিন কিছুক্ষণ পানিতে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর ঠান্ডা পানিতে সারারাত বা কমপক্ষে ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। ধোয়া সয়াবিনের সাথে বাটা হলুদ পরিমাণমত মিশিয়ে চুলায় ১ ঘন্টা সিদ্ধ করতে হয়। আলু ও ডিম সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ায়ে নিতে হয়। আলু ও ডিম পছন্দমত আকারে টুকরা টুকরা করে কাটতে হয়। শুকনা মরিচ ও জিরা কড়াইতে দিয়ে অল্প জ্বালে ভেজে নিয়ে ঠাণ্ডা করে গুঁড়া করতে হয়। অপর দিকে সিদ্ধ সয়াবিনের সাথে বাকি আলু, সিরকা বা ভিনেগার, লবণ ও অর্ধেক পরিমাণ শুকনো ভাজা মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে পরিমাণমত পানি দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হয়। পানি এমন পরিমাণ দিতে হবে যাতে এ মিশ্রণগুলো ডুবো ডুবো অবস্থায় থাকে। এ মিশ্রণ যখন ফুটতে আরম্ভ করবে তখন কাঁচা পেঁয়াজ ও কাটা কাঁচা মরিচ ছেড়ে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ফুটার পর চুলা নিভিয়ে সয়াবিন চটপটি নামাতে হয়। চটপটি খাবার জন্য অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে ডিম (স্লাইস করে কাটা), লেবুর রস এবং অবশিষ্ট জিরা ও মরিচের গুঁড়া উপরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

সয়া শিঙাড়া: সয়া ডাল ও গমের ময়দা ১২০ গ্রাম করে নিতে হবে। আলুর টুকরা, নারিকেল কুচি, মটর ডাল, ফুলকপির টুকরা, চীনাবাদাম ইত্যাদির সাথে লবণ, মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়াসহ অল্প পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভেজে শিঙাড়ার পুর তৈরি করা হয়। এ পুরে মাছ, মাংসের কিমা, কলিজা, পনির ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তারপর সয়া ডাল ও গমের ময়দার খামির তৈরি করে ডিমের আকারের ন্যায় রুটি বেলে মাঝ বরাবর কাটা হয়। কর্তিত অংশ হাতে নিয়ে পানের খিলির মতো ভাজ দিয়ে তার মধ্যে পুর ভরে দিতে হয়। সামান্য পানি লাগিয়ে শিঙাড়ার মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর চোখা মুখ উপরে রেখে থালায় সাজিয়ে রাখতে হয়। কড়াইয়ে তেল গরম করে হালকা আঁচে ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হয়। হালকা বাদামি ও মচমচে হলে চুলা থেকে নামিয়ে সসসহ খাওয়া যায়।

সয়া জিলাপি: জিলাপি তৈরির জন্য সয়া ময়দা ও গমের ময়দা ১:১ অনুপাতে ঘন করে গুলে শীতের দিনে দুই দিন এবং গরমের দিনে একদিন ঢেকে রাখতে পারলে ভালো হয়। এছাড়া সয়া ময়দা ও গমের ময়দা ৫-৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে জিলাপি তৈরি করা হয়। চিনি পানিতে গুলে জ্বাল দিয়ে ফুটে উঠলে ময়লা ছেঁকে নিতে হয়। তারপর গোলাপ জল বা কেওড়া জল মিশিয়ে সিরা তৈরি করতে হয়। ময়দার উপর হালকা বুদবুদ উঠলে জিলাপি তৈরির উপযোগী হয়। সয়া ময়দা ও গমের ময়দার উপরের জমানো পানি ফেলে সামান্য জর্দার রঙ দিয়ে ভালো করে ময়দা ও পানি স্টেয়ারিং করে বা নেড়ে ঘন গোলা তৈরি করতে হয়। চারকোণা মোটা কাপড়ের এক টুকরার মাঝে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর ভিজা কাপড়ে সয়া ময়দা ও গমের ময়দার গোলা নিয়ে পুঁটলি আকারে নিতে হয়। কড়াইতে তেল বা ঘি গরম করে সয়া ময়দা ও গমের ময়দার গোলার পুঁটলি কড়াইয়ের উপর ধরতে হয়। গোলা চাপ দিয়ে প্রথমে গোল করে এক প্যাচ, ২য় বার ২য় প্যাচ এবং ৩য় বার অর্ধেক প্যাচ করে গোলা গরম তেলে দিতে হয়। এভাবে আড়াই প্যাচের জিলাপি পরপর লম্বা করে তৈরি করতে হয়। অল্প আঁচে বাদামি করে ভেজে উল্টেপাল্টে চিনির সিরায় ৮-১০ মিনিট ডুবিয়ে সিরা ঝরিয়ে প্লেটে তুলতে হয়। জিলাপি গরম গরম পরিবেশন করলে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে।

সয়া রুটি বা পরোটা: এক ভাগ সয়া ময়দা ও চার ভাগ গমের ময়দা সহযোগে সয়া রুটি ও পরোটা তৈরি করা হয়।একটি পাতিলে সয়া ময়দা ও গমের ময়দা মিশিয়ে পরিমাণমত লবণ ও পানি মাখায়ে রুটির জন্য খামির তৈরি করতে হয়। এ খামির থেকে সাধারণ রুটি তৈরির মতো বেলে রুটি তৈরি করতে হয়। পরোটার জন্য খামির থেকে ছোট বল নিয়ে তাতে চাপ দিয়ে ভিতরে ও বাইরে সামান্য ডালডা মাখিয়ে কয়েকবার ময়দা দিতে হয়। এরপর বেলে রুটি বানাতে হয়। তেল ব্যবহার করে মোটা শীটের মতো বানানো হলে সেটি পরোটা এবং তেল ছাড়া পাতলা করে বানানো হলে সেটি রুটি হয়। এরপর তা ভেজে নিতে হয়। এই ভাবে সয়া লুচি, সয়া শিঙাড়া, সয়া পুরি, সয়া নিমকি, সয়া সেমাই ইত্যাদি সয়া খাদ্য স্বাভাবিক নিয়মে তৈরি করা যায়।


চিত্র ৫.১৩: সয়া পরোটা

২০২৫

৫.৩.৪ শিল্পজাত সয়া খাদ্য

সয়াবিন থেকে শিল্প পর্যায়ে খাবার তৈরি করতে হলে প্রথমে সয়াবিন ময়দা তৈরি করতে হয়। তারপর ময়দা দ্বারা সয়া চানাচুর, সয়া নাগেট, সয়া ছানা, সয়া দধি, সয়া দুধ, সয়া মাংস ইত্যাদি বানানো যায়।

সয়া ময়দা: ফুটন্ত পানিতে সয়াবিন ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। তবে পানি ফুটিয়ে জ্বাল দেওয়ার সময় ০.৫% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশিয়ে নিলে সয়াবিনে ক্ষতিকারক উপাদান অপসারিত হয়। সিদ্ধ সয়াবিন পরিষ্কার পানিতে ডলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। অতঃপর তা পাটিতে বা মাদুরে বিছিয়ে রোদে ভালোভাবে ২-৩ দিন ধরে শুকালে সয়াবিন শুকিয়ে কটকটে হয়। দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কটকট শব্দ করবে এবং ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যাবে। এবার গম ভাঙ্গার মেশিনে বেটে সয়া ময়দা তৈরি করা যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় সয়াময়দা ৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। ৫°সে তাপমাত্রায় ও ৫৯% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সয়া ময়দা পলিথিনে বায়ুরোধী করে রাখলে ভালো থাকে। শিল্প পণ্য তৈরির সময় সয়া ময়দার সাথে বিভিন্ন অনুপাতে গমের ময়দা মিশাতে হয়। কেননা সয়া ময়দায় গ্লুটেন (Gluten) না থাকায় গমের ময়দা (যা গ্লুটেনসমৃদ্ধ) যোগ করলে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে সুবিধা হয়।

সয়া চানাচুর: সয়া চানাচুরের জন্য সমপরিমাণ সয়া ময়দা, গমের ময়দা ও খেসারি বা ছোলার বেসন নিতে হবে। সকল ময়দা, বেসন, সয়াবিন, তেল, লবণ, মসলার গুঁড়া ও পরিমাণমত পানি দিয়ে মন্ড বা খামির তৈরি করতে হবে। সামান্য রঙ গুলিয়ে মণ্ডের সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এরপর খেসারি ডালের বেসন দিয়ে ঝুরি তৈরি করতে হবে। ঝুরির সাথে পরিমাণমত বাদাম ভাজা, ডাল ভাজা, চিড়া ভাজা, মটরডাল ভাজা প্রভৃতি মিশিয়ে প্যাকেটজাত করতে হয়। চানাচুরকে মুখরোচক করার জন্য ভাজা জিরার গুঁড়া বা অন্য কোনো মসলা মেশানো যেতে পারে।

সয়া দুধ: সাধারণত দুই পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরি করা যায়। যথা- সাধারণ পদ্ধতি ও আইএমএফ (Instant milk formula) পদ্ধতি।

সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরিকরণ: প্রথমে নিয়মানুযায়ী সয়া ময়দা তৈরি করতে হবে। এছাড়া ব্লেন্ডারে সয়াবিন মিহি করে গুঁড়া করা যায়। পানি মিশায়ে শিলপাটায় পেষা বা মেশিনে গুঁড়া করা সয়াবিন বেশ গাঢ় হয়। এ গাঢ় সয়াবিনকে লেই বলে। তারপর ৫:১ অনুপাতে ঈষৎ উষ্ণ পানি ও সয়াবিন মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হয়। এরপর এ মিশ্রণ



চিত্র ৫.১৪: সয়া দুধ

কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে দুধ বের করে অন্য একটি পাত্রে নিতে হয়। ছাঁকার পর অবশিষ্ট সয়াবিনের কাই আলাদা করে অন্য খাবারে ব্যবহার করা যায়। প্রাপ্ত সয়া দুধে চিনি এবং মসলা মিশিয়ে মৃদু জ্বালে প্রায় ১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় খাওয়া যায়। এ দুধ সহজে হজমযোগ্য যা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সয়া দুধের সাথে গরুর দুধ মিশিয়ে অথবা ভিটামিন বি$_১$ বা বি$_{১২}$ মিশিয়ে পুষ্টিমান বাড়ানো যায়। অনেক সময় সুগন্ধি মিশিয়ে রুচিসম্মত করা যায়।

IMF (Instant Milk Formula) পদ্ধতিতে সয়া দুধ: পুষ্ট পরিপক্ব রোগমুক্ত বাছাই করা সয়াবিন ৯০°সে. তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট ধরে মেশিনে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানোর পর ডিহালার (Dehuller) মেশিনে সয়াডাল ভাঙিয়ে এসপিরেটরেব (Aspirator) সাহায্যে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। এ খোসা ছাড়ানো সয়া ডাল স্টিম জ্যাকেটেড কেটলিতে নিয়ে শতকরা ০.২৫ ভাগ বেকিং সোডা মিশিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটাতে হয়। ফুটানোর পর সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিয়ে ৯৫°সে তাপমাত্রায় গরম পানি দিয়ে ধুতে হয়। ধোয়া সয়াবিন পুনরায় ০.০৫% বেকিং সোডা মিশানো ফুটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে পানি ফেলে দ্বিতীয়বার ৯৫° সে.তাপমাত্রায় গরম পানিতে ধুতে হবে। এখন ডিজইনটিগ্র্যাটর (Disintegrator) বা বিয়োজিত করা মেশিনের সাহায্যে গরম পানি সহযোগে স্লারি (Slurry) মন্ড প্রস্তুত করতে হবে। রোলার সয়ামিল্ক এক্সট্রাক্টর (Roller Soya milk Extactor) এর সাহায্যে অর্থাৎ রোলারের চাপে দুধ নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এ নিষ্কাশিত দুধ ১৫°সে. তাপে ১৫-২০ মিনিট হালকাভাবে ফুটিয়ে নিতে হয়। অন্যদিকে দুধ নিষ্কাশনের পর ছাঁকনির উপর পড়ে থাকা দ্রবণীয় পাউডার ও আঁশ জাতীয় পদার্থ অন্য খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মৃদু জ্বালে হালকাভাবে ফুটানো দুধ এখন হোমজিনাইজার (Homoginizer) এর সাহায্যে ৯৫°সে তাপমাত্রায় প্রথম ধাপে ৩৫০০ আরপিএম এবং দ্বিতীয় ধাপে ৫০০ আরপিএম এ হোমোজিনাইজড করে সয়া দুধের সকল উপাদান ভেঙে সংমিশ্রণ করে দুধের সান্দ্রতা সর্বত্র সমরূপ বা সমঘনত্ব করতে হয়। এরপর এয়ারকুলার (Air Cooler) বা ফ্যানের সাহায্যে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ১০°সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা করতে হয়। এই ঠান্ডা দুধ বাণিজ্যিক প্লাস্টিক বোতলে ৪°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে খাওয়া যায়।

সয়া দুধের সাথে গাভি, মহিষ, ছাগল ও মাতৃদুগ্ধে বিদ্যমান পুষ্টিমানের তুলনা (প্রতি ১০০ মিলি লিটারে) নিম্নের ছকে দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদান সমূহ	সয়াবিন	গাভীর দুধ	মহিষের দুধ	ছাগলের দুধ	মাতৃদুগ্ধ
১.	আমিষ (গ্রাম)	৩.৫	৩.৪	৩.৮	৩.৩	১.২
২.	চর্বি (গ্রাম)	১.৫	৩.৭	৭.৫	৪.১	৩.৮
৩.	ক্যালরি (Kcal)	৩৫	৬৯	১০০	৭৬	৭১
৪.	ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	২১	১২৫	২১০	১৩০	৩৩

উৎস : সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার- বি.এ.আর.আই, ২০০৮ ইং



চিত্র ৫.১৫: সয়া মাংস

সয়া মাংস বা সয়া ছানা: দেড় লিটার সয়া দুধ জ্বাল দিয়ে ফুটন্ত দুধে পরিমাণমত লেবুর রস বা সিরকা মিশিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হয় এবং দুধ জমতে শুরু করলে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হয়। ২-৩ মিনিটের মধ্যে সবটুকু দুধ জমে যাবে। জমা দুধ পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ছেঁকে সবটুকু ছানা আলাদা করে নিতে হবে। কাপড় খুব জোরে চেপে যতটুকু সম্ভব পানি বের করে নিতে হবে। কাপড়টি ১৫-২০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর কাপড় থেকে ছানা বের করতে হয়। উক্ত ছানা পছন্দ অনুযায়ী আকার দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে ভেজে মসলা মিশিয়ে তরকারিতে মাংসের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। টুকরোগুলো ঠান্ডা পানিতে রেখে এবং প্রতিদিন পানি পাল্টায়ে ৫-৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।



চিত্র ৫.১৬: সয়া দই

সয়া দধি: দেড় লিটার সয়া দুধের সাথে ১:৪ অনুপাতে গরুর দুধ বা গুঁড়া দুধ মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ৩০০ গ্রাম চিনি ও পছন্দমত মসলা মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হয়। দধি যে পাত্রে তৈরি করা হবে সে পাত্রটি প্রথমে ১ চা চামচ টক দধি দ্বারা মুছে কুসুম গরম দুধ ঢেলে নিয়ে ১০ মিনিট খোলা রাখতে হয়। পরে পাত্রের উপর পরিষ্কার সাদা কাগজ দ্বারা ঢেকে রাখলে ৬-৭ ঘন্টা পর সম্পূর্ণ দধি প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: সরিষার বীজ থেকে কাসুন্দি তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ কার্যক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ সরিষা হতে কাসুন্দি তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ কাসুন্দি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ ভালো মানের সরিষা নির্বাচন করবে।

১.৫ সরিষা পানিতে ধুয়ে তারপর রোদে শুকাবে।

১.৬ কাসুন্দি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

১.৭ কাসুন্দি তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

১.৮ তৈরিকৃত কাসুন্দি এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।

১.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.১০ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পানি
- রাই সরিষা ২৫০ গ্রাম
- শুকনা মরিচ ১-২ টি গুঁড়া করা
- হলুদের গুঁড়া ২ চা চামচ
- আদা বাটা
- জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- লবণ ১ চা চামচ বা পরিমাণমত
- সাইট্রিক এসিড প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম
- কাচের বোতল
- দারুচিনি গুঁড়া ১ চা চামচ
- যোয়ান ১ চা চামচ
- মৌরি ১ চা চামচ
- ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
- তেজপাতা ১-২ টি

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন

২০২৫

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- প্রথমে সরিষা ধুয়ে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।
- পরে তা শিলপাটায় বা গ্রাইন্ডিং মেশিন (Grinding Machine) এ গুঁড়া করে নিতে হয়।
- কড়াইতে পানি ফুটিয়ে তাতে সরিষার গুঁড়া, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া, আদা বাটা, লবণসহ অন্যান্য মশলা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়।
- চুলা থেকে নামানোর পূর্বে প্রতি কেজিতে ২-৩ গ্রাম সাইট্রিক এসিড (citric acid) মিশাতে হয়। সাইট্রিক এসিডের পরিবর্তে কয়েক টুকরা কাঁচা আম ব্যবহার করা যায়।
- এরপর কাসুন্দি মাটির পাতিলে ভরে পাতিলের মুখ বন্ধ করে ২-৩ দিন রেখে দিতে হয়। কাসুন্দি রাখার কাচের বৈয়াম গরম পানিতে জাল দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হয়। বোতলের উপরিভাগে ১/৮ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে রাখতে হয়। কাসুন্দি ভর্তি বোতল ৫-৭ দিন রোদে দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

এই জবটি আট বার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

জব নং-০২

জবের নাম: সয়াবিন হতে সয়াদুধ তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

২.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

২.২ সরিষা হতে কাসুন্দি তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

২.৩ কাসুন্দি তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

২.৪ ভালো মানের সরিষা নির্বাচন করবে।

২.৫ সরিষা পানিতে ধুয়ে তারপর রোদে শুকাবে।

২.৬ কাসুন্দি তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

২.৭ কাসুন্দি তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

২.৮ তৈরিকৃত কাসুন্দি এয়ার টাইট পাত্রে সংরক্ষণ করবে।

২.৯ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

২.১০ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পানি
- সয়া বিন ২৫০ গ্রাম
- ছাঁকার কাপড়
- তেজপাতা ১-২ টি
- দারুচিনি
- চিনি
- এলাচ ২-৩ টি
- জীবাণুমুক্ত কাচের বোতল

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- পরিপুষ্ট, রোগমুক্ত, পরিষ্কার সয়াবিন ডাল ৭-৮ ঘণ্টা বা ১ রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।

- চুলায় পানি জ্বাল দিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে ভিজানো সয়াবিন ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ সয়াবিন নামিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার পানিতে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- খোসা ছাড়ানো সয়াবিনের সাথে অল্প অল্প গরম পানি মিশিয়ে শিল-পাটায় পিষে ১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে মিশালে সোয়া লিটার দুধ তৈরি হবে।
- পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে উক্ত দ্রবণ ছেঁকে নিলে যে তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে তাই সয়াদুধ।
- এই দুধ, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি ও পরিমাণমত চিনি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। পরিবেশনের সময় সামান্য ভ্যানিলা বা চকলেট বা পাটালি গুড় মিশিয়ে দেয়া যায়।
- সয়া দুধের অবশিষ্টাংশ দিয়ে সয়া হালুয়া ও সয়া পিঠা তৈরি করা যায়।

এই জবটি সাত বার অনুশীলন করতে হবে।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।
- বাটা সয়াবিনের সাথে ৫ গুণ পানি মেশাতে হবে।
- সয়াবিন কে ভালোভাবে ভেজানো ও সিদ্ধ করতে হবে অন্যথায় এর গন্ধ যাবে না।

অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্যে তেলের আসল কাজ কী?
২. আমাদের দেশের তেল সমৃদ্ধ ফসল গুলো কী কী?
৩. আমাদের দৈনিক কতটুকু তেল খাওয়া প্রয়োজন?
৪. ১ গ্রাম তেল থেকে কত ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?
৫. ঘানিতে সর্বাধিক কত ভাগ তেল নিষ্কাশন করা যায়?
৬. সরিষার পাউডার কি কাজে লাগে?
৭. তিলের তৈরি কয়েকটি খাবারের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্যে তেল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?
২. উদ্বায়ী, অনুদ্বায়ী ও ভোজ্যতেল বলতে কী বুঝায়?
৩. সরিষার তেলের পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
৪. চিনাবাদাম তেলের গুণাগুণ উল্লেখ কর।
৫. ঘানি দিয়ে কীভাবে তেল নিষ্কাশন করে?
৬. সরিষা তেলের উপকারিতা ও অপকারিতা লখ।
৭. সরিষার পাউডার তৈরির পদ্ধতি লেখ।
৮. চীনাবাদাম থেকে কী কী খাদ্য তৈরি হয়?
৯. চীনাবাদামের বাটার কীভাবে তৈরি করা হয়?
১০. সয়া পিঁয়াজু তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১১. সয়া ময়দা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেলের পুষ্টি গুণাগুণ বর্ণনা কর।
২. সরিষা ও তিল বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. চিনাবাদামের কী কী খাদ্য হয় এবং যেকোনো ৫টি খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৪. তিল থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৫. শিল্প পর্যায়ে সয়াবিন থেকে ময়দা, সয়া চানাচুর, সয়া দধি ও সয়া ছানা তৈরির প্রণালি লিখ।
৬. সাধারণ পদ্ধতিতে সয়া দুধ তৈরির প্রণালি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলুর পরিচিত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

Introduction to Potato, Processing and Storage





আলু হল শর্করাসমৃদ্ধ একটি কন্দজাতীয় ফসল। আলুর জাতগুলো বিভিন্ন রঙ, আকার এবং আকৃতিতে দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বে অনেক দেশেই আলু প্রধান খাদ্য। পৃথিবীতে সবজি হিসেবে আলুর মোট উৎপাদন সর্বাধিক। আলু আমাদের দেশের আদি ফসল নয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চল থেকে প্রথমে ইউরোপে এবং তারপর পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই চতুর্থ স্থানে আছে আলু।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আলুর পরিচিতি সম্পর্কে জানতে পারব।
- আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারব।
- আলু থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারব।

৬.১ আলুর পরিচিতি

আলু বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান সবজি যা সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। আলু একটি কন্দজাতীয়,এক বর্ষজীবী ফসল। সাধারণত ২ থেকে ৩টি চোখবিশিষ্ট কন্দের রোপণ খন্ডের মাধ্যমে আলুর বংশবিস্তার করা হয়। বীজ থেকে একই জাতের হুবহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। কান্ড সোজা বা ভূশায়ী, লিকলিকে, কাক্ষিক শাখাযুক্ত বা শাখাবিহীন। ফল গোলাকার, বাদামি সবুজ বা রক্তবর্ণের হয়। জনপ্রিয় জাতসমূহের কন্দ সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে।

৬.১.১ আলুর জাত, মৌসুম ও বৈশিষ্ট্য

আলুর প্রায় ৪০০০ এর উপরে জাত রয়েছে। আমাদের দেশে প্রধানত দুই (০২) জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে। যথা- দেশি জাত ও উচ্চফলনশীল উন্নত জাত।

বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু এবং ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

দেশি জাত: ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায়। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। কিছু দেশি জাত আছে যা উন্নত জাতের চেয়ে নাবি। দেশি জাতের আলু তুলনামূলকভাবে খেতে খুব সুস্বাদু। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি দামে বিক্রি হয়। দেশি জাতসমূহের মধ্যে আউশা, চল্লিশা, দোহাজারী লাল, ফেইন্তাশীল, হাসরাই, লাল পাকরী লালশীল, পাটনাই, সাদা গুটি, শীল বিলাতী ও সূর্যমূখী। দেশি জাতগুলো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। দেখা গেছে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেশি জাতের আলুর ফলন কমে যায়। তাই দেশি জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করে লাগানো উচিত।

উচ্চফলনশীল জাত: ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব উন্নত জাতের আলুর চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হিরা, আইলসা, পেট্রোনিস, মুল্টা, ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল, মন্ডিয়াল, কুফরী সিন্দুরী, চমক, ধীরা, গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা ও চিনেলা জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। বারি টিপিক্রস-১ এবং বারি টিপিক্রস-২ নামে ২টি হাইব্রিড জাতের আলু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে অবমুক্তি পাওয়া কিছু জাতের নাম, উৎপাদনের মৌসুম, হেক্টর প্রতি ফলন, ও বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো-

সারণি-৬.১: আলুর জাত, মৌসুম, ফলন ও বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক নং	জাতের নাম	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	বৈশিষ্ট্য
১.	বারি আলু-১ (হীরা)	রবি মৌসুম	২৫-৪০	মৌসুমের আগে অথবা পরেও রোপন করা যায়। মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।
২.	বারি আলু-২ (মরিনি)	রবি মৌসুম	২৫-৩০	আলু সাদা, ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের।
৩.	বারি টিপিএস-১ (টিউবারলেট)	রবি মৌসুম	সিডিলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব।
৪.	বারি টিপিএস-২	রবি মৌসুম	সিডিলিং টিউবার	ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন
	(টিউবারলেট)		৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব।

৬.১.২ আলুর পুষ্টিমান

আলু ভাতের চেয়ে পুষ্টিকর। শর্করার জোগান দেওয়ার পাশাপাশি আলু নানা ধরনের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা মেটায়। পাশাপাশি খাদ্য আঁশ থাকায় আলু হজমে সহায়ক এবং রক্তে শর্করার হার ঠিক রাখে। নিম্নের সারণিতে টাটকা ও সিদ্ধ আলুর তুলনামূলক পুষ্টিমান দেখানো হলো।

সারণি-৬.২: আলুর পুষ্টিমান

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদান	আলু	
		টাটকা	সেদ্ধ
১.	পানি (%)	৭৭.৫	৭৯.৮
২.	আমিষ (%)	২.১	২.০
৩.	স্নেহ (%)	০.১	০.১
৪.	মোট শর্করা (%)	১৮.৫	১৮.৫
৫.	আঁশ (%)	২.১	১.৩
৬.	ক্যালরি	৮০.০	৭৬.০
৭.	ছাই (%)	১.০	০.৯

৬.১.৩ আলুর ব্যবহার

আলুর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। নিচে আলুর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- সবজি/তরকারি হিসেবে আলু ব্যবহার করা হয়।
- ভর্তা হিসেবে খাওয়া হয়।
- আলু ভাজি হিসেবে খাওয়া যায়।
- আলু হতে স্টার্চ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।
- আলুর ডাল রান্না করে খাওয়া যায়।
- আলু থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য যেমন- ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

৬.১.৪ আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ: যে পদ্ধতিতে আলুকে পরিষ্কার করে আকার-আকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অথবা না ঘটিয়ে এবং ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায় তাকে আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। যেমন- আলুর তরকারি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ।

আলুর সংরক্ষণ পদ্ধতি

উৎপাদন মৌসুমে আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বিধায় আলু সংরক্ষণ করতে হয়। আলু দুইভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যথা-

স্থানীয়ভাবে ঘরে সংরক্ষণ: মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু উত্তোলন করা ঠিক নয়। আলু সকালের দিকে উত্তোলন করতে হয়। আলু সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হলে তুলতে হয়। আলু তোলার ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে আলুর ছাল বা চামরা শক্ত করতে হয়। তাতে সংরক্ষণ গুণ বাড়ে। আলু তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোদাল বা লাঙ্গলের আঘাতে আলু কেটে না যায়। আলু তোলা শেষে পরিবহনের জন্য চটের বস্তা ব্যবহার করাই ভালো। সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার

করা উত্তম। যদি বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঝুড়ির মাঝখানে চট বা ছালা বিছিয়ে সেলাই করে নিতে হয়। আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে আলু ক্ষেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিছিয়ে পাতলা কাপড় বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। আলু ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন বেশি জোরে বেশি উঁচু থেকে আলু ঢালা না হয়। আলু সংগ্রহ শেষে ১-৭ দিন পরিষ্কার ঠান্ডা জায়গায় আলু বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিতে হয়। এতে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও পোকার আক্রমণ থেকে আলু রক্ষা পাবে। এভাবে আলু রেখে দেওয়ার পদ্ধতিকে আলুর কিউরিং (Curing) বলে। আলু সংরক্ষণ করার আগে কাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হয়। সংগ্রহের ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু পরিষ্কার করে আকার অনুযায়ী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রেড করতে হয়। বাছাই করা আলু ঠান্ডা ও বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়। আলু সংরক্ষণের জন্য ছনের ছাউনি দেয়া ও বড় গাছের ছায়ায় অবস্থিত ঘর সবচেয়ে উপযোগী। মেঝেতে বা বাঁশের মাচায় প্রথমে পাতলা করে ঔষধ মিশ্রিত বালু (৩ টন শুকনা বালুর সাথে ১ কেজি সেভিন পাউডার কীটনাশকের গুঁড়া মিশাতে হবে) বিছিয়ে তার উপর আলুর অনধিক ১৫ সে.মি. পুরু স্তর বসাতে হবে এবং তা আবার বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এছাড়া ঘরের তাকে ও চৌকির নিচে আলু বিছিয়ে রাখা যায়। সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হয়। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখা মাত্র ফেলে দিতে হবে। আলুর সুতলি পোকা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে বাছাই করে অনেক দূরে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণ: আলু মাঠের উচ্চ তাপমাত্রা থেকে এনে সরাসরি হিমাগারে রাখা সমীচীন নয়। আলু উঠানোর পর পরিষ্কার করে ৭-১০ দিন শুকানোর পর মূল হিমকক্ষে না রেখে ২৪ ঘন্টা প্রি-কুলিং (Precooling) করতে হয়। হিমাগারের র‍্যাকে ৫-৬টি স্তর করে আলু রাখা হয়। আলু উঠিয়ে শুকানোর পর হিমাগারে ৭-১০ দিনের মধ্যে আলু বস্তায় ভরে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। হিমাগারে প্রথম ১৫-২০ দিন প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ৫-১০ মিনিট করে হিমকক্ষগুলোতে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজটি রাতের বেলায় করা উচিত। পরবর্তী ৩ মাসে ৫ দিন অন্তর ১ বার এবং অবশিষ্ট সময়ে ৭ দিন অন্তর ১ বার করে উপরোক্ত কাজটি করতে হয়। এছাড়া হিমাগারের আলু জুন মাসে ও আগস্ট মাসে বস্তাগুলোর স্থান পরিবর্তন করে নিচের র‍্যাকের আলু উপরে ও উপরের আলু নিচে রাখা হয়।

হিমাগারে বীজ আলু খাবার আলুর চেয়েও নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় কারণ নিম্ন তাপমাত্রায় খাবার আলু মিষ্টি হয়ে যায়। হিমাগার থেকে বের করে আলু সরাসরি উচ্চ তাপমাত্রায় না নিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় (১৩°- ১৮°সে.) প্রি-হিটিং (Pre-heating) চেম্বারে ২৫ ঘন্টা রাখতে হয়। এ ছাড়া আলু ভালো অবস্থায় রাখার জন্য গুদাম ঘরের মেঝে ও দেওয়ালসমূহে কপার সালফেটের ($CuSO_4$) দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত।

সংরক্ষিত আলুর ক্ষতিকারক পোকামাকড়: বাংলাদেশে বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে যে পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে তা হচ্ছে আলুর সুতলি পোকা (Potato tuber worm)। এরা খাদ্য হিসেবে শুধু আলুই খেয়ে থাকে। সুতলী পোকার কীড়া বা লার্ভা আলুর ভেতরে সুড়ঙ্গ করে খায় এবং এতে আলু নষ্ট হয়ে যায়। শুধু লার্ভা অবস্থাতেই এরা আলুর ক্ষতি করে থাকে। এ ছাড়া সুতলী পোকার তৈরি করা সুড়ঙ্গ দিয়ে

ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক আলুর ভিতরে প্রবেশ করে আলুকে পচিয়ে দেয়। পূর্ণাঙ্গ সুতলী পোকা একটি মথ। এটি দেখতে অত্যন্ত ছোট। পাখা ছড়ানো অবস্থায় ১৫ মি.মি. চওড়া। এদের দেহের রঙ রুপালি বা হাল্কা গোলাপি বর্ণের। এদের পাখায় গাঢ় বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা ও কিনারায় সরু লোমের ঝালর যুক্ত। স্ত্রী মথ গুদামে রক্ষিত আলুর চোখে বা তার আশপাশে ডিম পাড়ে। এ ছাড়া এরা রক্ষিত আলুর বস্তায়ও ডিম পাড়ে।

প্রতিকার

- বাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার একটি স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সে.মি.) দিয়ে দিতে হবে।
- আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলী পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

৬.২ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য

আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন খাবারের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

- আলুর রুটি বা চাপাতি
- আলুর তরকারি
- আলুর ডাল বা স্যুপ
- আলুর চপ
- আলু ভাজা
- আলুর পিঠা
- আলুর মিষ্টান্ন
- আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই
- আলুর চিপস
- আলুর শিঙাড়া
- আলুর আচার
- আলুর চটপটি
- আলুর সস্ ইত্যাদি।

৬.২.১ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন ঝাল জাতীয় খাদ্য

আলু এমন এক খাদ্য যা বহুবিধ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে হিমায়িত (Frozen) অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। প্রক্রিয়াজাতকৃত আলু সংরক্ষণ ও পরিবহণ খুবই সহজ। নিম্নে আলু হতে প্রক্রিয়াজাতকৃত কয়েকটি খাদ্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

আলুর চিপস (Potato Chips): আলু ছিলে পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আলু বঁটি বা ছুরি দিয়ে ১.৫ মিমি. পুরু গোল করে কেটে লবণ পানিতে (১ লিটার পানিতে ১ চা চামচ লবণ) ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত সয়াবিন তেলে কাটা আলু ভেজে আলু চিপস তৈরি করা যায়। শুকনো চিপস বানাতে হলে লবণ পানি থেকে আলুর টুকরোগুলো পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা মশারির নেটের উপর রেখে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর বায়ুরোধী টিন বা পলিব্যাগে ভরে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। খাওয়ার সময় তেলে ভেজে লবণ ছিটিয়ে নিতে হবে।


চিত্র ৬.১: আলুর চিপস

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (French Fry): আলুর প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের ব্যবহার সর্বাধিক। প্রথমে বড় ও লম্বা আলু ছিলে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। খোসা ছাড়ানো আলু ৫-১০ সেমি লম্বা ফালি করে কেটে নিয়ে লবণ, মরিচ বাটা ও গোল মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে ৫-১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। অনেক সময় ফালি সোজা না করে খাঁজ কাটা অবস্থায় কাটা হয়। অতঃপর এ ফালিগুলো ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয়। তেল ঝরিয়ে মাংস সহযোগে পরিবেশন করলে উপাদেয় হয়। ১০০ কেজি আলু থেকে ৫০-৭৫ কেজি ফ্রাই তৈরি করা যায়। হিমায়িত অবস্থায় এই ফ্রাই বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়।


চিত্র ৬.২: আলুর ফ্রেঞ্চফ্রাই

আলু ভাজি: আলু চিকন ফালি করে কেটে ধনে, হলুদ, জিরা, পেঁয়াজ ইত্যাদি মসলা সহযোগে তেলে ভেজে নিতে হয়। প্রথমে বাটা মসলাসহ আলু তেলে কষিয়ে পানি যোগ করতে হবে। পানির পরিমাণ এমন হবে যেন এটা শুকিয়ে আসার সাথে সাথে আলুও সিদ্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় আলুর সাথে শিম, বেগুন, করলা ইত্যাদি সবজি মিশানো হয়। আলু ভাজি আমাদের অতি প্রিয় খাদ্য, যা ভাত, রুটি ও পরোটার সাথে খাওয়া যায়।

আলু ভর্তা: সিদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ডলে কাই করা হয়। এরপর এর সাথে কাঁচামরিচ বা শুকনো পোড়া মরিচ, পেঁয়াজ ও সরিষার তেল ভালো করে মিশিয়ে সুস্বাদু ভর্তা (Mashed potato) তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে ভর্তা শুধু ভাতের সাথে খাওয়া হয় কিন্তু এটা প্রধান খাদ্য এবং নাস্তা হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। মাখন, সিদ্ধ কাঁচা মরিচ, গাজরের কুচি ইত্যাদি দিয়ে ভর্তা তৈরি করা যেতে পারে। এতে স্বাদ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। বিদেশে এরূপ ভর্তা প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় এবং দোকানে হিমায়িত বা ফ্রোজেন (Frozen) অবস্থায় পাওয়া যায়।

আলুর দম: ছোট আলু সিদ্ধ করে মসলা সহযোগে তেলে কষাতে হবে। তারপর সামান্য পানি দিয়ে কিছুক্ষণ পর চুলা থেকে নামালে তা আলুর দম হয়। আলুর দম হলো এক ধরনের আলুর নিরামিষ তরকারি ছাড়া কিছুই নয়।

আলুর চপ: সিদ্ধ আলু ভালো করে ডলে কাই তৈরি করে তাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ লবণ, রসুন, কাঁচা মরিচের কুঁচি, ধনিয়া বা পুদিনা পাতা, গোল মরিচের গুঁড়া ইত্যাদি মিশিয়ে নেওয়া হয়। আলাদাভাবে মাংসের কিমা সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে তেলে ভেজে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট আকৃতির চপ তৈরি করে ভিতরে পুর হিসেবে ভাজা কিমা বা সিদ্ধ ডিমের টুকরা ব্যবহার করা যেতে পারে।


চিত্র ৬.৩: আলুর চপ

আলুর রুটি ও পরোটা: আটা এবং ময়দার সাথে সিদ্ধ আলুর কাই বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুটি ও পরোটা তৈরি করা যেতে পারে। আলুর পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগের বেশি হবে না, অন্যথায় কাই বা মিশ্রণের আঠালোভাব নষ্ট হয়ে রুটি তৈরি হবে না।

আলু মাংস স্যুপ: কোনো খাবারের প্রারম্ভে যে তরল বা পানীয় জাতীয় আইটেম খেতে দেয়া হয় তাই স্যুপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যুপ ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য দেয়া হয়। প্রথমে মাংস তেলে ভেজে বাদামি করতে হয়। তারপর পানি দিয়ে হাড় থেকে মাংস খুলে না আসা পর্যন্ত সিদ্ধ করতে হয়। এরপর মাংসের পানি ছেঁকে

নিয়ে তাতে মাংস ভেঙ্গে মেশাতে হবে। আলুর টুকরা, গাজর, তেজপাতা, পেঁয়াজ, লবণ, টমেটো, মরিচ একসাথে আধা ঘণ্টা জ্বাল দিতে হবে। এরপর তৈরি স্যুপের সাথে ধনে পাতার কুচি দিয়ে ১৫ মিনিট জ্বাল দিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করা যায়।

আলুপুরি: আলুপুরি তৈরিতে ময়দা, সিদ্ধ আলু, আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ ইত্যাদি দিতে হবে। প্রথমে আলু পরিমাণমত পানি, আদা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ দিয়ে মৃদু আঁচে সিদ্ধ করতে হবে। আলু সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে ভালোভাবে নেড়ে নামাতে হবে। মরিচ ভেজে গুঁড়া করতে হবে। পেঁয়াজ বেটে পেস্ট তৈরি করতে হবে। আলুর সঙ্গে গুঁড়া মরিচ, পেঁয়াজ পুদিনা পাতা ও লবণ মিশাতে হবে। আদার সঙ্গে ২ চামচ লবণ ও ৬ টেবিল চামচ তেল বা ডালডা দিয়ে মাখাতে হবে। আধা কাপ পানি দিয়ে ময়দা মাখাতে হবে। তবে খামির নরম করা যাবে না। ময়দা এবং আলু সমান ভাগ নিতে হবে। এক ভাগ গোল করে মাঝে আলু ভরে মুখ বন্ধ করতে হবে। পিঁড়িতে হালকা ময়দা ছিটিয়ে পুরির মুখ বন্ধ দিক নিচে রেখে বেলতে হয়। সাবধানে বেলতে হবে যেন আলু বের না হয়। আলুপুরি ডুবো তেলে কম আঁচে মচমচে করে ভাজতে হয়। সস, চাটনি বা আচার দিয়ে পরিবেশন করলে খেতে সুস্বাদু হয়।



চিত্র ৬.৪: আলু পুরি

৬.২.২ আলু থেকে তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য

আলুর হালুয়া ও বরফি: সিদ্ধ আলু ভালো করে কাই তৈরি করে তার সাথে পরিমাণমত চিনি ও গরম মসলা মিশিয়ে ঘি কিংবা ডালডায় কষিয়ে নিয়ে হালুয়া তৈরি করতে হবে। কষাবার সময় সর্বক্ষণ নাড়তে হবে যাতে এটি পুড়ে পাত্রের গায়ে লেগে না যায়। একটি ট্রেতে ঘি মাখিয়ে তার উপর গরম হালুয়া ঢেলে সমান করে নিতে হবে। উপরে কিশমিশ, বাদাম কুঁচি বসিয়ে দিতে হবে। এরপর নরম থাকতেই ছুরি দিয়ে কেটে বরফি তৈরি করতে হবে।



চিত্র ৬.৫: আলুর জিলাপি ও বরফি

আলুর জিলাপি: সমপরিমাণ সিদ্ধ আলু ও ময়দা নিতে হবে। আলু ছিলে ডলে কাই করে ময়দা, রঙ, পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ময়ান তৈরি করতে হবে। মিশ্রণ এমন হবে যাতে ঢেলে ফেলা যায় কিন্তু পানির মতো পড়ে ছড়িয়ে যাবে না। একটি পাত্রে চিনি জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করা হয়। লোহার কড়াইতে সয়াবিন তেল বা ডালডা গরম করতে হয়। তেল গরম হলে ৩০×৩০ সে.মি. কাপড়ের মাঝখানে ছিদ্র করে ভিজিয়ে নিতে হয়। কাপড়ের ভিতর মিশ্রণ নিয়ে পুঁটলি তৈরি করে চাপ দিলে ছিদ্র দিয়ে মিশ্রণ নলাকারে বের হয়। এবার কড়াইয়ের উপর চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আড়াই প্যাঁচের জিলাপি বানাতে হয়। একটু শক্ত হলে উল্টিয়ে দিতে হয়। বাদামি রঙ ধারণ করলে ঝাঁঝরি হাতা দিয়ে তুলে সিরায় ডুবিয়ে দিতে হয়। মিনিটখানেক পর তুলে সিরা ঝরিয়ে ডিশে আলুর জিলাপি সাজিয়ে রাখতে হয়।

২০২৫

ব্যবহারিক অংশ (জবশিট/অপারেশন শিট/এক্সপিরিমেন্ট শিট)

জব নং-০১

জবের নাম: আলুর চিপস প্রস্তুতকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।
১.২ আলুর চিপস তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
১.৩ আলুর চিপস তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
১.৪ আলুর চিপস তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।
১.৫ চিপস তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।
১.৬ তৈরিকৃত আলুর চিপস এয়ার টাইট পাত্র/পলিথিনে সংরক্ষণ করবে।
১.৭ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।
১.৮ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

২০২৫

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- সয়াবিন তেল ৩০০ গ্রাম
- লবণ ২-৩ গ্রাম
- আলু ৩০০ গ্রাম
- ভাজা মরিচ গুঁড়া ২ গ্রাম
- হলুদের গুঁড়া ১ গ্রাম
- জিরা গুঁড়া ২ গ্রাম
- লবঙ্গ ও দারুচিনি গুঁড়া পরিমাণমত
- প্রিজারভেটিভ
- পানি



চিত্র ৬.৬: আলুর স্লাইস ও চিপস

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট: ওয়েট ব্যালেন্স

কার্যপদ্ধতি

- স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- ছুরি বা স্লাইসারের সাহায্যে ১-১.৫ মি.লি. পুরু করে আলুর চিপস কাটতে হবে এবং লবণ পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- স্লাইসগুলো চালুনি বা বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে পানি ঝরাতে হবে। স্লাইসগুলো কিছুদিন সংরক্ষণ করতে হলে ব্লাঞ্চিং করে পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট (KMS) দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিতে হবে।
- কড়াইতে ডুবো তেল এ স্লাইসগুলো ছেড়ে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত হাতা দিয়ে না
- আলুর স্লাইসগুলো বাদামি হলে চিপসগুলো হাতার সাহায্যে তেল ঝরিয়ে ট্রে বা কাগজের শিটের উপর রাখতে হবে। ভাজার পরে ছবি
- চিপস ঠান্ডা হওয়ার পূর্বেই লবণের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হয়। যাতে চিপসের গায়ে লবণ বসে যায়।

এই জবটি ছয় বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

২০২৫

জব নং-০২

জবের নাম : আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরিকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ আলু ভালো করে পরিষ্কার করে ফালি করে কাটবে।

১.৫ আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির কৌশল পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করবে।

১.৬ ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসারে আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির করবে।

১.৭ আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির সতর্কতা বা সাবধানতা অবলম্বন করবে।

১.৮ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৯ চেকলিস্ট অনুযায়ি সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- সয়াবিন তেল ৩০০ মি.লি.
- লবণ ৫-৭ গ্রাম
- আলু ১ কেজি
- ভাজা মরিচ গুঁড়া ২ গ্রাম
- হলুদের গুঁড়া ১ গ্রাম
- জিরা গুঁড়া ২ গ্রাম
- লবঙ্গ ও দারুচিনি গুঁড়া পরিমাণমত
- প্রিজারভেটিভ
- পানি


চিত্র ৬.৭: আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট : ওয়েট ব্যালেন্স

কার্যপদ্ধতি

- প্রথমে স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- আলু ধুয়ে শুকিয়ে খোসা ছিলে নিতে হবে।
- ছুরির সাহায্যে ১ সে.মি. প্রস্ত ও ১ সে.মি. পুরু এবং যতটুকু সম্ভব লম্বা করে ফালি কাটতে হবে।
- ফালিগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে চালুনিতে উঠায়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
- কর্তিত ফালিগুলোকে গরম পানিতে আধা সিদ্ধ করে শর্করার হার কমিয়ে তেলের শোষণতা ৬% এ নামিয়ে আনতে হবে।
- তারপর ফালিগুলো লবণ, গোলমরিচ ও লাল মরিচের গুঁড়ো ও সামান্য পানি দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।
- তেল বা ঘি গরম করে তাতে ফালিগুলো ঢেলে দিয়ে ওলটপালট করে ৩-৫ মিনিট ভাজতে হবে।
- ভাজা হলে নামিয়ে গরম গরম সসের সাথে পরিবেশন করতে হবে।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।

জব নং-০৩

জবের নাম : মিষ্টি আলুর হালুয়া প্রস্তুতকরণ।

পারদর্শিতা/মূল্যায়ন মানদন্ড

১.১ স্টান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার করবে।

১.২ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

১.৩ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।

১.৪ মিষ্টি আলু ছোট ছোট করে কেটে পরিমাণমত দুধ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।

১.৫ ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসারে মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির করবে।

১.৬ কাজ শেষে কার্যস্থান ও উপকরণ পরিষ্কার করবে।

১.৭ মিষ্টি আলুর হালুয়া তৈরির সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবে।

প্রয়োজনীয় পিপিই

- হ্যান্ড গ্লোভস
- অ্যাপ্রন
- সেফটি গগলস
- সেফটি স্যু
- হেয়ার নেট
- সেফটি মাস্ক

প্রয়োজনীয় টুলস

- চামচ
- সসপ্যান
- চুলা
- পলিথিন
- চাকু
- ছিদ্রযুক্ত হাতা
- চালুনি
- ট্রে/কাগজের শীট
- কড়াই

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- দুধ ১ কাপ

- চিনি বা গুড় ১ কাপ
- মিষ্টি আলু ২ কাপ
- ঘি ১ কাপ
- গোলাপ জল ১ টেবিল চামচ
- পেস্তা বাদাম কুচি পরিমাণমত সাজানোর জন্য
- এলাচ গুঁড়া ১ চা চামচ
- দারুচিনি ছোট ২ টুকরা
- জাফরান ১ চিমটি
- লবণ স্বাদমত
- পানি

প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট

- ওয়েট ব্যালেন্স
- শিলপাটা/ব্লেন্ডার মেশিন
- হ্যান্ড/ডিজিটাল রিফ্রাক্টোমিটার

কার্যপদ্ধতি

- স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করতে হবে।
- নির্বাচিত বড় বড় রোগমুক্ত খোসা ছাড়ানো মিষ্টি আলু পরিষ্কার পানিতে চুবিয়ে রাখতে হবে।
- মিষ্টি আলু ধুয়ে পানি ঝেড়ে নিতে হবে এবং ছোট টুকরা করে কাটতে হবে।
- কাটা মিষ্টি আলু সসপ্যানে দুধ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ মিষ্টি আলু চটকিয়ে ম্যাশ করে নিতে হবে।
- কড়াইতে ঘি দিয়ে গরম করে এলাচ গুঁড়ো, দারচিনি দিয়ে মিষ্টি আলুর ম্যাশ দিয়ে নাড়তে হবে।
- মিষ্টি আলু ফুটতে শুরু করলে চিনি দিয়ে হালকা আঁচে নাড়তে হবে।
- পানি কমে আসলে জাফরান ও গোলাপজল দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে।
- এখন মাখা মাখা হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে পেস্তা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করব।

এই জবটি পাঁচ বার অনুশীলন করতে হবে ।

২০২৫

সতর্কতা

- ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ভালোভাবে পরিধান করতে হবে।
- শিক্ষকের গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে।
- কাজের প্রসিডিউর সঠিক ভাবে মেনে কাজ করতে হবে।
- চুলার তাপ ভালো করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অনুশীলনী-৬

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলু কোন ধরনের ফসল?
২. আলুর তৈরির দুইটি খাদ্যের নাম লেখ।
৩. আলুতে শর্করার পরিমাণ কত?
৪. আলুর দম বলতে কী বুঝায়?
৫. ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বলতে কী বুঝায়?
৬. আলুতে আমিষের পরিমাণ কত?
৭. আলুতে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলুর পরিচিতি বর্ণনা কর।
২. বারি আলু ১ ও ২ জাত দুটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
৩. বাংলাদেশে উৎপাদিত ৫টি আলুর জাতের নাম লেখ।
৪. দেশি জাতের আলুর বৈশিষ্ট্য লেখ।
৫. আলুর সুতলী পোকা আক্রমণের ধরন বর্ণনা কর।
৬. আলুর চিপস তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কীভাবে তৈরি করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশি আলু ও উচ্চ ফলনশীল আলুর বর্ণনা দাও।

২. আলুর পুষ্টিমান ও স্থানীয়ভাবে আলু সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. আলু থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

৪. খাদ্য হিসেবে আলুর গুরুত্ব বর্ণনা কর?

৫. আলু হতে হালুয়া তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

সমাপ্ত

২০২৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

এগ্রোবেসড ফুড-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।